স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. রামায়ণ 2
২. মহাভারত 21
৩. জড়ভরতের উপাখ্যান 51
৪. প্রহ্লাদ-চরিত্র 56
৫. জগতের মহত্তম আচার্যগণ 62
৬. কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা 81
৭. ভগবান্ বুদ্ধ 91
৮. ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট 108
৯. ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার 127
১০. মহম্মদ 129
১১. পাওহারী বাবা 133
১২. মদীয় আচার্যদেব 149
১৩. শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত 184

১. রামায়ণ

[১৯০০ খ্রীঃ ৩১ জানুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় ‘সেক্সপীয়র ক্লাবে’ প্রদত্ত বক্তৃতা]

সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য আছে; অবশ্য আরও শত শত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য বিদ্যমান। যদিও প্রায় দুই সহস্র বর্ষের উপর হইল সংস্কৃত আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমি আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যদ্বয়ের বিষয় বলিতে যাইতেছি। ঐ দুইটিতেই প্রাচীন ভারতবাসিগণের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর, উহাকে রামের জীবনচরিত বলা যায়। রামায়ণের পূর্বেও ভারতে পদ্য-সাহিত্য ছিল। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকার ছন্দে রচিত; কিন্তু ভারতে সর্বসম্মতিক্রমে এই রামায়ণই আদিকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামায়ণের কবির নাম মহর্ষি বাল্মীকি। পরবর্তী কালে অপরের রচিত অনেক আখ্যানমূলক কবিতা, ঐ প্রাচীন কবি বাল্মীকির পরিচিত নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। শেষে এমন দেখা যায় যে, অনেক শ্লোক বা কবিতা তাঁহার রচিত না হইলেও সেগুলি তাঁহারই বলিয়া মনে করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকিলেও আমরা এখন উহা যে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত, জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই।

* * *

অতি প্রাচীন কালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত। সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। আত্মীয়বর্গের

ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়—দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কি জন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?' দস্যু উত্তরে বলিল, 'আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।' দেবর্ষি বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে।' দস্যু বলিল, 'নিশ্চয়ই, তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।' তখন দেবর্ষি বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও, তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পারিব না। তার পর তুমি বাড়ি গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইসঃ তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তেমনি তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিনা?' দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া দস্যু তাঁহাকে সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পৌঁছিয়াই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞেসা করিল, 'পিতা, আমি কিরূপে আপনাকে ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন?' পিতা উত্তর দিলেন, 'না আমি জানি না।' তখন পুত্র বলিল, 'আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করি।' পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি! তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস্, এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তুই পতিত, তোকে আজ হইতে ত্যাজ্য পুত্র করিলাম।' তখন দস্যু তাহার মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকেও ঐ প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাঁহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'উঃ, কি ভয়ানক কথা!'

দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'শোন মা, স্থির হও। ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে?' মাতা তখন দশ হাত পিছাইয়া অম্লান বদনে বলিলেন, 'কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি তো কখনও দস্যুবৃত্তি করি নাই।' তখন সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; বলিল, 'শোন প্রিয়ে, আমি একজন দস্যু; অনেক কাল ধরিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারাই তোমাদের সকলের ভরণপোষণ করিতেছি; এখন আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি কি আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্তুত?' পত্নী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল, 'কখনই নহে। তুমি আমার ভর্তা, তোমার কর্তব্য আমার ভরণপোষণ করা। তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোষণ কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব?'

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিলঃ এই তো দেখিতেছি সংসারের নিয়ম! যাহারা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদের জন্য আমি এই দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে দেবর্ষিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সকল কথা তাহার নিকট বর্ণনা করিল। পরে সে কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিল, 'প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন, বলে দিন—আমি কি করিব।' তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি এই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি তো দেখিলে পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে না, অতএব ঐ পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে; আর যে-দিন তুমি কপর্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। একমাত্র যিনি সুখদুঃখ, পাপপুণ্য সকল অবস্থাতেই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তুমি তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ যথার্থ ভালবাসায় বেচাকেনা নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।'

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দিবারাত্র প্রার্থনায় ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'মহর্ষি ওঠ।' দস্যু চমকিত হইয়া বলিল, 'মহর্ষি কে? আমি তো দস্যুমাত্র।' গম্ভীরকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হইলঃ তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি 'বাল্মীকি' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে, তোমার দেহের চারিদিকে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই।—এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

এই মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবি হইলেন এখন সেই কথা বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথীসলিলে অবগাহনের জন্য যাইতেছেন, দেখিলেন এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরস্পরকে চুম্বন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চমিথুনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই এই আনন্দের দৃশ্যটি শোকদৃশ্যে পরিণত হইল, কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। সেই তীরে বিদ্ধ হইয়া পুংক্রৌঞ্চটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চী কাতরভাবে তাহার সঙ্গীর মৃতদেহের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোকদৃশ্য দেখিয়া পরম করুণার্দ্র হইল। কে এই নিষ্ঠুর কর্ম করিল, তাহা জানিবার জন্য তিনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন।

তখন তাঁহার মুখ হইতে যে শ্লোক নির্গত হইল তাহার ভাবার্থঃ

ওরে ব্যাধ, তুই কি পাষণ্ড, তোর একবিন্দুও দয়ামায়া নাই! ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্তের জন্যও হত্যাকার্যে বিরত নহে!

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদিত হইল, 'এ, কি? এ আমি কি উচ্চারণ করিতেছি! আমি তো কখনও এমন ভাবে কিছু বলি নাই।' তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেনঃ বৎস ভীত হইও না, তোমার মুখ হইতে এইমাত্র যাহা বাহির হইল, ইহার নাম 'শ্লোক'। তুমি জগতের হিতের জন্য এইরূপ শ্লোকে রামের চরিত বর্ণনা কর।–এইরূপে কবিতার প্রথম আরম্ভ হইল। আদিকবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক করুণাবশে স্বতই নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

* * *

ভারতে অযোধ্যা নামে এক প্রাচীন নগরী ছিল, উহা এখনও বর্তমান। এখনও ভারতের যে প্রদেশে ঐ নগরীর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিত্রে ঐ প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা। অতি প্রাচীন কালে সেখানে দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন রাণী ছিলেন, কিন্তু কোন রাণীরই সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তাই ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু আচারের অনুবর্তী হইয়া রাজা ও রাণীগণ সন্তানকামনায় ব্রতোপবাস, দেবারাধনা প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের চারটি পুত্র জন্মিল, সর্বজ্যেষ্ঠ রাম। ক্রমে এই রাজপুত্রগণ মনোহর কাব্য 'রামায়ণ' অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

জনক নামে আর একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার সীতা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল, অতএব সীতা পৃথিবীর কন্যা ছিলেন, জনক-জননী ছাড়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সীতা' শব্দের অর্থ হলকৃষ্ট ভূমিখণ্ড। তাঁহাকে ঐরূপ স্থানে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এরূপ অলৌকিক জন্মের কথা

অনেক পাঠ করা যায়। কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না। কাহারও বা পিতামাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও জন্ম যজ্ঞকুণ্ড হইতে, কাহারও বা শস্যক্ষেত্রে ইত্যাদি ইত্যাদি—ভারতের পুরাণে এ-সকল কথা আছে।

পৃথিবীর দুহিতা সীতা নিষ্কলঙ্কা ও পরম শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। রাজর্ষি জনকের দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজর্ষি তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভারতে প্রাচীনকালে স্বয়ম্বর নামক এক প্রকার বিবাহপ্রথা ছিল—তাহাতে রাজকন্যাগণ নিজ নিজ পতি নির্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্যা বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া বরমাল্যহস্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভাট যাইত। সে পাণিগ্রহণার্থী প্রত্যেক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমর্যাদাদি কীর্তন করিত। রাজকন্যা যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বয়ম্বরস্থলে কখনও কখনও ভাবী বরের বিদ্যা-বুদ্ধি-বল পরীক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ পণ নির্দিষ্ট থাকিত।

অনেক রাজপুত্র সীতাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। ‘হরধনু’ নামক এক প্রকাণ্ড ধনু যে ভাঙিতে পারিবে, সীতা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্বয়ংবরে ইহাই ছিল পণ। সকল রাজপুত্রই এই বীর্যপরিচায়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। অবশেষে রাম ঐ দৃঢ় ধনু হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হরধনু ভগ্ন হইলে সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবে রাম-সীতার পরিণয় সম্পন্ন হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, সেজন্য প্রাচীন ভারতে রাজার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ

রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রের বিবাহের পর রাজা দশরথ ভাবিলেনঃ আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমগ্র অযোধ্যা এই অভিষেক-সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে দশরথের প্রিয়তমা মহিষী কৈকেয়ীর জনৈকা পরিচারিকা–বহুকালপূর্বে রাজা রাণীকে যে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। এক সময়ে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, ‘তুমি যে-কোন দুইটি বর প্রার্থনা কর, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা দান করিব!’ কিন্তু কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ঐ বরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুষ্টস্বভাবা দাসী তাঁহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না; বরং তাঁহার পুত্র ভরত রাজা হইলে তঁহার সুখের অন্ত থাকিবে না। এইরূপে সে কৈকেয়ীর হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিল। দাসীরা পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রাণীর হৃদয়ে প্রবল ঈর্ষার উদ্রেক হইল, তিনি অবশেষে ঈর্ষাবশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুষ্টা দাসী রাজার বরদান-অঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, ‘সেই অঙ্গীকৃত বর-প্রার্থনার ইহাই উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।’

বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে কৈকেয়ী যখন রাজার নিকট ঐ দুইটি অনিষ্টকর বর প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বুঝিলেন, তিনি কখনও নিজ সত্য ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাঁহাকে এই উভয়সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্য স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্বক রাজ্যত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিলেন, সঙ্গে চলিলেন প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ইঁহারা কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

আর্যগণ সে-সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান্ ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ-অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন। যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ্য করিবে? অরণ্যে কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি কিরূপে সেখানে আমার সঙ্গে যাইবে?' সীতা তাহাতে উত্তর দেনঃ আর্যপুত্র যেখানে যাইবেন, সীতাও সেখানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আপনি আমাকে 'রাজকন্যা', 'রাজবংশে জন্ম' এ-সব কথা কি বলিতেছেন! আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।—অগত্যা সীতা সঙ্গে চলিলেন। আর রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের মুহূর্তমাত্র বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং তিনিও কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতে কিছুদিন বাস করিলেন। পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে গমন করিয়া গোদাবরীতীরবর্তী পরম রমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটীর বাঁধিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগয়া করিতেন ও ফলমূল আহার করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। এইরূপ কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন সেখানে এক রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল, সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী। যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে রামের দর্শন পাইল এবং তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভাব ছিলেন, তা-ছাড়া তিনি বিবাহিত; সুতরাং রাক্ষসীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। রাক্ষসী প্রতিহিংসাবশতঃ তাহার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া রামভার্যা পরমাসুন্দরী সীতার বিষয় তাহাকে সবিস্তারে জানাইল।

মনুষ্যমধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্ ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, কাহারও এত শক্তি ছিল না যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করে। সুতরাং সীতাহরণের জন্য রাবণকে মায়া

অবলম্বন করিতে হইল। সে অপর এক রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল। সেই রাক্ষস পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট মনোহর নৃত্য অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা ঐ মায়ামৃগের রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য ঐ মৃগটিকে ধরিয়া আনিতে রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মৃগটিকে ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কুটীরের চতুর্দিকে একটি মন্ত্রপূত গণ্ডী কাটিয়া সীতাকে বলিলেন, ' দেবী, আমার বোধ হইতেছে—আজ আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পারে। অতএব আপনাকে বলিতেছি, আপনি আজ কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্ডীর বাহিরে যাইবেন না।' ইতোমধ্যে রাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সেই মৃগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে কুটীরে এক গভীর আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল—যেন রাম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'লক্ষ্মণ ভাই, এস, আমায় রক্ষা কর।' সীতা শুনিয়া অমনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ তুমি অবিলম্বে বনমধ্যে গমন করিয়া আর্যপুত্রকে সাহায্য কর।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'এ তো রামচন্দ্রের স্বর নহে।' কিন্তু সীতার বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া কুটীরের সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা বলিলেন, 'আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন; তিনি আসিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব।' সন্ন্যাসী বলিল, 'শুভে, আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, অতএব কুটীরে যাহা কিছু আছে, এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর।' এই কথায় সীতা আশ্রমে যে ফলমূল ছিল সেগুলি আনিয়া ভিক্ষুককে গণ্ডীর ভিতরে আসিয়াই তাহাকে লইতে বলিলেন। কিন্তু কপট ভিক্ষুক তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—ভিক্ষাজীবীর নিকট তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে ভিক্ষা দিতে পারেন। ভিক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় সীতা যেমনি গণ্ডীর বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্ন্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহণ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বারা বলপূর্বক ধারণ করিল এবং নিজ

মায়ারথ আহ্বান করিয়া তাহাতে রোরুদ্যমানা সীতাকে বলপর্বক বসাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। আহা! সীতা তখন নিতান্ত নিঃসহায়া, এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্গ হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতাকে তাহার নিজ রাজ্য লঙ্কায় লইয়া গেল, সীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা সতীত্ব-ধর্মের সাকার বিগ্রহ ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছায়, যতদিন না তিনি তাহার পত্নী হইতে স্বীকৃত হন, ততদিন তাহাকে দিবারাত্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, সেখানে সীতা নাই, তখন তাহাদের শোকের আর সীমা রইল না। সীতার কি দশা হইল, তাঁহারা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন দুই ভ্রাতা মিলিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনই সন্ধান পাইলেন না। অনেক দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর একদল ‘বানরের’ সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভূত হনুমানও ছিলেন। আমরা পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামের পরম বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া সীতা-উদ্ধারে রামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত গভীর ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাঁহাকে প্রভুর আদর্শ সেবকরূপে পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা দেখিতেছেন, ‘বানর’ ও ‘রাক্ষস’ শব্দে দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপে অবশেষে ‘বানর’গণের সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, আকাশ দিয়া একখানি রথ যাইতে তাহারা দেখিয়াছিল, তাহাতে একজন ‘রাক্ষস’ বসিয়াছিল, সে এক রোরুদ্যমানা পরমাসুন্দরী রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া

যাইতেছিল; আর যখন রথখানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজগাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার দেখাইল। প্রথমে লক্ষ্মণই সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটি লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে অগ্রজের পত্নীকে এতদূর ভক্তি করা হইত যে, লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই, সুতরাং বানরগণ-প্রদর্শিত অলঙ্কারটি সীতার কণ্ঠহার ছিল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। এই আখ্যানটিতে ভারতের প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।

সেই সময় বানর-রাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ চলিতেছিল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। রাম সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে সুগ্রীবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। সুগ্রীব এই উপকারের কৃতজ্ঞতা- স্বরূপ রামকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব সর্বত্র বানর সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের বহু সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া বলপূর্বক তাহার উপপত্নী করিয়াছিল। হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, ‘সীতা কখনও তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন না। ওরূপ স্থানে বাস অপেক্ষা তিনি নিশ্চয় মৃত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করিবেন।’ এই ভাবিয়া হনুমান অন্যত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন—সীতা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা; তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্বিতীয়ার শশিকলা আকাশে সবেমাত্র উদিত হইতেছে। হনুমান তখন একটি ক্ষুদ্র বানরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর বসিলেন; সেখান হইতে দেখিতে

লাগিলেন, রাবণপ্রেরিতা রাক্ষসীগণ আসিয়া সীতাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সীতা রাবণের নাম পর্যন্ত শুনিতেছেন না।

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান নিজরূপ ধারণ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেবী, রামচন্দ্র আপনার অন্বেষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।' এই বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয়-উৎপাদনের জন্য চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছে জানিতে পারিলেই রামচন্দ্রের স্বসৈন্য লঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদন করিয়া হনুমান অবশেষে করজোড়ে বলিলেন, 'দেবীর যদি ইচ্ছা হয় তো দাস আপনাকে স্কন্ধে লইয়া এক লম্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে পারে।' কিন্তু সীতা মূর্তিমতী পবিত্রতা; সুতরাং হনুমানের অভিপ্রায় মত কার্য করিতে গেলে পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ হইবে বলিয়া তিনি হনুমানের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হনুমান যথার্থই সীতার সন্ধান পাইয়াছেন, রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি শুধু তাঁহাকে নিজ মস্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান ঐ চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের নিকট হইতে সীতার সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিল। উহার নাম 'সেতুবন্ধ'—ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ-সকল দুষ্কর কর্ম কিরূপে সম্প্রদান করিলেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

বানরগণ সেতুবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিল এবং তাহার উপর রাশীকৃত শিলাখণ্ড ও মহীরূহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা কাঠবিড়াল বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে এবং নিজের গা ঝাড়া দিতেছে। এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যানুসারে বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতু-নির্মাণকার্যে সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহারা এক-একজন একবারেই এক-একটি পাহাড়, এক-একটি জঙ্গল ও রাশীকৃত বালুকা লইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কাঠবিড়ালটির ঐরূপ বালুকার উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। রামচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কাঠবিড়ালটির মঙ্গল হইক, সে তার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রমাণ।' এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলেন। এখনও কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে যে লম্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে উহা রামচন্দ্রের অঙ্গুলির দাগ।

সেতুনির্মাণকার্য শেষ হইলে রাম ও তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদয় বানরসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল; অবশেষে রাক্ষসাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহত হইল। তখন সুবর্ণময় প্রাসাদভূষিত রাবণের রাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের সুদূর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে সেখানকার লোকদিগকে 'আমি লঙ্কায় গিয়াছি' বলিলে তাহারা বলিত, 'আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সেখানকার সমুদয় গৃহ সুবর্ণ-নির্মিত।' যাহা হউক, এই স্বর্ণময়ী লঙ্কা রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষ লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ রামচন্দ্র বিভীষণকে এই সুবর্ণময়ী লঙ্কা প্রদান করিলেন এবং রাবণের স্থানে তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন। বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে সীতা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে রাম লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন।

রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তখন রামের অনুজ কৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তিনি রামের বনগমনের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না; অযোধ্যায় আসিয়া যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের সীমা রইল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামের শোকে অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভরত ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অরণ্যে রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার পিতার স্বর্গগমনবার্তা নিবেদন করিলেন এবং ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস না করিলে পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না।' চতুর্দশ বর্ষ পরে তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামের আজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরম অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে কোনমতে সম্মত হইলেন না; সিংহাসনের উপর রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা-উদ্ধারের পরই রামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং ভরত তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন আরোহণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে সিংহাসন আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাণার্থে রাজাকে যে-সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে সেগুলি গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তুকে কেমন মমতাশূন্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং সীতার সহিত পরম সুখে কাটাইলেন।

এইরূপ কিছুকাল অবগত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করায় প্রজাবর্গ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। রাবণবিজয়ের পরই রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও সমবেত বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। সীতা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন রামচন্দ্র এই ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন—বুঝি সীতাকে হারাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অগ্নিদেব স্বয়ং সেই অগ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন। তাঁহার মস্তকে এক হিরণ্ময় সিংহাসন, তদুপরি সীতাদেবী উপবিষ্ট। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের এবং সমবেত সকলের আনন্দের সীমা রইল না। রাম পরম সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্নিপরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা দেখে নাই, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনি যে সেখানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? রাজা এইরূপ অবস্থায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া ধর্মবিগর্হিত কার্য করিতেছেন; হয় সর্বসমক্ষে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে বিসর্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেয়।

প্রজাগণের সন্তোষের জন্য সীতা অরণ্যে নির্বাসিতা হইলেন। যে স্থানে সীতা পরিত্যক্তা হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাঁহাকে একাকিনী রোরুদ্যমানা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দিলেন। সীতা তখন আসন্নপ্রসবা ছিলেন; ঐ আশ্রমেই তিনি দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করাইয়া যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়া উহাতে সুর-তাল সংযোজন করেন।

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এগুলিকে লোকে ধর্মসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের ধারণা—প্রেমসঙ্গীতই হউক বা

যাহাই হউক, সঙ্গীতমাত্রেই যদি কেহ তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণে সুর-তাল সংযোগ করিয়া রামের পুত্রদ্বয়কে উহা গাহিতে শিখাইলেন।

ভারতে প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ করিতেন, রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার ছিল না, ধর্মকার্যের সময়ে পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকিবে। সেইজন্য পত্নীর অপর একটি নাম সহধর্মিণী—যাঁহার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানকালে পত্নী সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কর্তব্যটুকু না করিলে কোন ধর্মকার্যই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, ‘তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।’ সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্তি নির্মিত হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্বসাধারণের ধর্মভাব ও আনন্দবর্ধনের জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল; কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি নিজ শিষ্য দুইটিকেকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, উহারা রামের অজ্ঞাত তাঁহারই পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ-গানের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল।

সভাস্থলে রাম ও তদীয় অমাত্যবর্গ এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ শ্রোতৃমণ্ডলীরূপে আসন গ্রহণ করিলেন। বিপুল জনতার সমাবেশ হইল। বাল্মীকির শিক্ষামত লব ও কুশ রামায়ণের গান করিতে লাগিল; তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য-দর্শনে ও মধুস্বর-শ্রবণে সমগ্র সভামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইল। সীতার প্রসঙ্গ বার বার শ্রবণ করিয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জন-প্রসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, 'আপনি শোকার্ত হইবেন না, আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া বাল্মীকি সভাস্থলে সীতাকে আনিলেন। সীতাকে দেখিয়া অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য রামকে সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনরায় পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে হইল। বারংবার তাঁহার উপর এরূপ নিষ্ঠুর অবহেলা হতভাগিনী সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিবার জন্য দেবগণের নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল। সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন. 'এই আমার পরীক্ষা।' এই কথা বলিয়া তিনি পৃথিবীর বক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রজাবর্গ এই অদ্ভুত ও শোচনীয় ব্যাপার-দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। রাম শোকে মুহ্যমান হইলেন।

সীতা অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, 'পৃথিবীতে আপনার কার্য শেষ হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন।' এই বাক্যে রামের স্বরূপ-স্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি অযোধ্যার নিকট সরিদ্বরা সরযূর জলে দেহ বিসর্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা ভারতবাসীদের আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা— পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়া। এই সকল চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর ভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম

আদর্শ- রূপে আজও বর্তমান। পাশ্চাত্য দেশের বক্তব্য, ‘কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।’ ভারতের বক্তব্য ‘দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।’ মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, ভারত এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কিনা, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সীতাচরিত্রে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতে অনুসৃত হইয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে—সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত আদর্শ তেমন হয় নাই। ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য, ‘সীতা’ নামটি তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে-ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, ‘সীতা’ বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন নারীকে আশীর্বাদ করেন, তিনি তাহাকে বলিয়া থাকেন, ‘সীতার মত হও’; বালিকাকে আশীর্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় নারীগণ সকলেই সীতার সন্তান। তাঁহারা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা, সদা-পতিপরায়ণা, নিত্য-পবিত্র সীতার মত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশ্যে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও নির্গত হয় নাই। এ-সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করাকে তিনি নিজ কর্তব্য বলিয়া ভাবিয়াছেন এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। অরণ্যে সীতার নির্বাসন-ব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন, কিন্তু সেজন্য তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, ‘আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতের একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।’ ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল, তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করিবার চিন্তা পর্যন্ত কখনও করেন নাই।

কে জানে, এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্য-মতানুযায়ী এই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা প্রাচ্যদেশীয় কষ্টসহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা?

পাশ্চাত্যবাসীরা বলেন, 'দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করিয়া, উহা নিবারণ করিয়া আমরা দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।' ভারতবাসী বলেন, 'দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া আমরা উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া আর কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরমসুখ হইয়া দাঁড়াইবে।' যাহাই হউক, এই দুইটি আদর্শের জয় কোনটিই হেয় নহে। কে জানে—পরিণামে কোন্ আদর্শের জয় হইবে? কে জানে—কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে? কে জানে, কোন্ ভাব অবলম্বন করিলে পশুভাবকে বশীভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করা সম্ভব হইবে? সহিষ্ণুতা বা ক্রীয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার?

পরিণামে যাহাই হউক, ইতোমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোন আদর্শকে, কোন প্রণালীকে, কোন পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমি পাশ্চাত্যগণকে এ কথা কখনও বলি না, 'আপনারা আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন'; কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্তু উপায় কখনও এক হইতে পারে না। অতএব আমি আশা করি—আপনারা ভারতের আদর্শ, ভারতের সাধন-প্রণালীর কথা শুনিয়াই ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, 'আমরা জানি, আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং আমাদের উভয়ের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে দুইটি উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠিক উপযোগী। আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী অনুসরণ করুন, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।' আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি, বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন-চেষ্টাই আমার জীবনব্রত। জীবনের উপত্যকার আঁকাবাঁকা পথে চলিবার সময় আমরা যেন পরস্পরকে বলিতে পারি, 'তোমার যাত্রা সফল হউক।'

২. মহাভারত

[১৯০০ খ্রীঃ ১ ফেব্রুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনা ‘সেক্সপীয়র ক্লাবে’ প্রদত্ত বক্তৃতা]

গতকাল আমি রামায়ণ মহাকাব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। অদ্যকার সান্ধ্যসভায় অপর মহাকাব্য ‘মহাভারত’ সম্বন্ধে কিছু বলিব। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ভরত হইতে যে বংশ প্রবর্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজাদের উপাখ্যান আছে। উক্ত ভরত রাজা হইতেই ভারতবর্ষের নাম হইয়াছে, এবং তাঁহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম ‘মহাভারত’ হইয়াছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান্ অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ; অথবা মহান্ ভারতবংশীয়গণের উপাখ্যান। কুরুদিগের প্রাচীন রাজ্যই এই মহাকাব্যের রঙ্গক্ষেত্র, আর এই উপাখ্যানের ভিত্তি—কুরুপাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্বসাধারণের বড়ই আদরের সামগ্রী। হোমারের কাব্য গ্রীকদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কালক্রমে মূল মহাভারতের সহিত অনেক অবান্তর বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল, শেষে উহা প্রায় লক্ষশ্লোকাত্মক এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হইল। কালে কালে মূল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুরাণ, দার্শনিক নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, পরিশেষে উহা এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অবান্তর প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদয় গ্রন্থের ভিতর মূল উপাখ্যানটি অনুস্যূত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামক একবংশজাত জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ।

আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে আসেন। ক্রমে আর্যগণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্যগণই ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রভুত্বলাভের চেষ্টা হইতেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি সৈন্যদলের অধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই মহাভারতের যুদ্ধ।

কুরুবংশীয় মহারাজ বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে—অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ এবং ক্ষয়রোগ এবং অন্য কোন প্রকার জন্মগত ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি পৈতৃক কোন ধরনের অধিকারী হইতে পারে না, সে কেবল নিজ ভরণপোষণের ব্যয় মাত্র পাইতে পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না, পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র ছিল এবং পাণ্ডুর মাত্র পাঁচটি। অল্প বয়সে পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে ধৃতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যভার পড়িল, তিনি পাণ্ডুর পুত্রগণকে নিজের পুত্রগণের সহিত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধনুর্ধর বিপ্র দ্রোণাচার্যের উপর তাঁহাদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইল; দ্রোণাচার্যের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতা ও বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাঁহারা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শৌর্যবীর্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তিদর্শনে অন্ধ রাজার পুত্রগণের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের চাতুরীতে এক ধর্মমহোৎসব-দর্শনের ছলে পঞ্চপাণ্ডব বারণাবত নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় দুর্যোধনের উপদেশানুসারে তাঁহাদের জন্য শণ, জতু, লাক্ষা, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা এক প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। সেই জতুগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। সেখানে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলে পর সেই গৃহে এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধর্মাত্মা বিদুর—দুর্যোধন ও

তাঁহার অনুচরবর্গের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্বেই অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলের অজ্ঞাতসারে প্রজ্বলিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন, এত দিনে আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম, এখন আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট, দৈবদুর্বিপাক সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্যবীর্য ও সহিষ্ণুতাবলে সর্ববিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাইলেন, শীঘ্র নিকটবর্তী পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইবে।

আমি গত রাত্রে এই স্বয়ম্বরপ্রথার বিষয়ে একবার১ উল্লেখ করিয়াছি। কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বরের সময় চতুর্দিক হইতে নানা দেশের রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বর-সভায় আহূত হইতেন। এই সকল সমবেত রাজকুমারদের মধ্য হইতে রাজকুমারীকে ইচ্ছামত বর মনোনীত করিতে হইত। ভাট রাজপরিচারকগণ মাল্যহস্তে রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া প্রত্যেক রাজকুমারের সিংহাসনের নিকট গিয়া তাঁহার নাম ধাম বংশমর্যাদা শৌর্যবীর্যের বিষয় উল্লেখ করিত। রাজকন্যা এইসব রাজপুত্রদের মধ্যে যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ একজন প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীর রূপগুণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডবেরা শুনিলেন, সেই দ্রৌপদীই স্বয়ম্বরা হইবেন।

স্বয়ম্বরে প্রায়ই রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার শৌর্যবীর্যের পরিচয়, অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রুপদরাজ স্বয়ম্বর-সভায় তদীয় কন্যার

পাণিগ্রহণার্থিগণের বলপরীক্ষার এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেনঃ অতি ঊর্ধ্বদেশে আকাশে এক কৃত্রিম মৎস লক্ষ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নদেশে সতত ঘূর্ণমান মধ্যভাগে ছিদ্রযুক্ত একটি চক্র স্থাপিত ছিল, আর নিম্নে একটি জলপাত্র। জলপাত্রে মৎসের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মৎস্যের চক্ষু যিনি বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ম্বর-সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য সমুৎসুক, সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

আপনারা সকলেই ভারতের বর্ণচতুষ্টয়ের বিষয়ে অবগত আছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ– ব্রাহ্মণ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পৌরোহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য; ব্রাহ্মণের নীচে ক্ষত্রিয়–রাজা ও যোদ্ধাগণ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; তৃতীয়–বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী; চতুর্থ–শূদ্র বা সেবক। অবশ্য এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্তা ছিলেন।

যখন রাজপুত্রগণ একের পর এক চেষ্টা করিয়া কেহ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন দ্রুপদ রাজপুত্র সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়েরা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অকৃতকার্য হইয়াছেন, এক্ষণে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; ব্রাহ্মণই হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শূদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।'

ব্রাহ্মণগণমধ্যে পঞ্চপাণ্ডব সমাসীন ছিলেন, তন্মধ্যে অর্জুনই পরম ধনুর্ধর। দ্রুপদপুত্রের পূর্বোক্ত আহ্বান-শ্রবণে তিনি উঠিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অতি শান্তপ্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ নম্রস্বভাব। শাস্ত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা সাহসের কর্ম করা নিষিদ্ধ। ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংযমে সতত নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম। অতএব তাঁহারা কিরূপ শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়, ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণেরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই ব্যক্তির

আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশী অর্জুনকে তাঁহার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, অতএব তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অবলীলাক্রমে ধনু তুলিয়া উহাতে জ্যা রোপণ করিলেন। পরে ধনু আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণ ক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্যবস্তু—মৎসটির চক্ষু বিদ্ধ করিলেন।

তখন সভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী অর্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে রাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভায় সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম করিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা পরমাসুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন, স্থির করিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত রাজাদের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবরা কোনমতেই পরাভূত হইলেন না, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে জননী কুন্তী সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা, সুতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে তাঁহাদিগকেও বাহিরে গিয়া ভিক্ষাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুন্তী উহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। পঞ্চভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কৌতুকবশে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।’ কুন্তী না দেখিয়াই বলিলেন, ‘যাহা আনিয়াছ, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।’ এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘একি! এ আমি কি কথা বলিলাম, এ যে এক কন্যা!’ কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করা তো যায় না, মাতৃ-আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের জননী জীবনে

কখনও মিথ্যা কথা উচ্চারণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। এইরূপে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্মিণী হইলেন।

আপনারা জানেন, সমাজের সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাভারত-প্রণেতা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন—ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটির উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজেই এমন এক অবস্থা ছিল, যখন বহুপতিত্ব অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক নারীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্তী আভাসমাত্র।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'যে পঞ্চ ব্যক্তি আমার ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কাহারা! আমার ভগিনী যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিল, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সে-ই বা কে! ইহাদের তো অশ্বরথ বা অন্য কোনরূপ ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেখিতেছি না। ইহারা তো পদব্রজেই চলিয়া গেল দেখিলাম'' মনে মনে এই সকল বিতর্ক করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গোপনে রাত্রে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। তখন দ্রুপদরাজ তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনেকে প্রথমে এইরূপ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। সুতরাং দ্রুপদরাজকেও এইরূপ বিবাহে সম্মত হইতে হইল; রাজকুমারী পঞ্চপাণ্ডবদের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল।

পরিণয়ের পর পাণ্ডবগণ দ্রুপদগৃহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহাদের বলবীর্য বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা জীবিত আছেন, দগ্ধ হন নাই—ক্রমে এই সংবাদ কৌরবগণের নিকট পৌঁছিল। দুর্যোধন ও তাঁহার অনুচরবর্গ পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন। বহুদিনের পর প্রজাবর্গ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নামক মনোহর নগর নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারতের তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্য রাজ্যসূয় যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই যজ্ঞে পরাজিত রাজগণকে কর সহ আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে যজ্ঞোৎসবের এক একটি কার্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞকার্যে সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে একটি বিষম বিঘ্ন ছিল। জরাসন্ধ নামক জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ছিয়াশি জন রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও সম্মত হইলেন। চতুর্দশ দিবস ক্রমাগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে পরাভূত করিলেন। তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রত্যেকে এক এক দিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন ও সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনয়ন করিলেন।

তাঁহারা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়লব্ধ অগাধ ধনসম্পত্তি ঐ বিরাট যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্রগণও এই যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুট পরিধান করিলেন এবং 'রাজচক্রবর্তী' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই সময় হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্য নূতন বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের রাজ্য ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি দুর্যোধনের অসহ্য মনে হইল, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল ঈর্ষার ভাব লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। এইরূপে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন কিরূপে ছলে ও কৌশলে পাণ্ডবগণের সর্বনাশ সাধন করিতে পারেন। কারণ, তিনি জানিতেন বলপূর্বক পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবিদ্ ও দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আহূত হইলেন।

প্রাচীন ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে সর্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত; এইরূপে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইয়া ক্রীড়া করিলেই মানরক্ষা হইত; আর ক্রীড়ায় অসম্মত হইলে তাহা অতি অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারত বলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ববিধ ধর্মের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়াছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কপট পাশা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতেই যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন ততবারই হারিতে লাগিলেন। বার বার এইরূপ পরাজিত হওয়াতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জয়লাভের আশায় একে একে তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে একে সকলই হারাইলেন। তাঁহার রাজ্য, ঐশ্বর্য সর্বস্ব এইরূপে নষ্ট হইল। অবশেষে যখন তাঁহার রাজ্য

ঐশ্বর্য কৌরবগণ কর্তৃক বিজিত হইল, অথচ তিনি বার বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন নিজ ভ্রাতৃগণ, নিজে স্বয়ং এবং সুন্দরী দ্রৌপদী ব্যতীত পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। এইগুলিও তিনি একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমস্তই হারাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন। কৌরবগণ তাঁহাদিগকে অবমাননা করিতে আর কিছুই বাকী রাখিলেন না; বিশেষতঃ তাহারা দ্রৌপদীকে যেরূপ অবমানিতা করিল, মানুষের প্রতি মানুষ কখনও সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। অবশেষে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় পাণ্ডবগণ কৌরবদের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ্যশাসনের অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন দেখিল বড় বিপদ, তাহার সব কৌশল বুঝি ব্যর্থ হয়; সুতরাং সে পিতাকে আর একবার মাত্র অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেন। এবার পণ রহিল—যে-পক্ষ হারিবে, সে পক্ষকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই অজ্ঞাতবাসের সময় জয়ী পক্ষ অজ্ঞাতবাসকারীদের কোন সন্ধান পায়, তবে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু বিজিত পক্ষ যদি অজ্ঞাতবাসের সম্পূর্ণ কাল অজ্ঞাতভাবে যাপন করিতে পারে, তবে তারা আবার রাজ্য পাইবে।

এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠিরের হার হইল; তখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত নির্বাসিত গৃহহীনদের বনে গমন করিলেন। তাঁহারা অরণ্যে কোনরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময় তাঁহারা ধার্মিক ও বীরপুরুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কার্য অনুষ্ঠিত করেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানসমূহ দর্শন করেন। মহাভারতের এই বনপর্বটি বড়ই মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ, ইহা নানাবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক মনোহর অপূর্ব উপাখ্যান আছে। এই নির্বাসনের সময় মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যাহাতে নির্বাসন-দুঃখ অক্লেশে সহিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রাচীন

ভারতের অনেক মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি উপাখ্যান আমি আপনাদিগকে বলিব।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী নামে তাঁহার এক পরমাসুন্দরী গুণবতী কন্যা ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র মন্ত্রের নাম 'সাবিত্রী'। এই কন্যার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহারও সাবিত্রী নাম রাখা হইয়াছিল। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতা তাঁহাকে স্বামী মনোনীত করিতে বলিলেন। আপনারা দেখিতেছেন, ভারতে প্রাচীন রাজকন্যাগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। অনেক সময়েই তাঁহারা পাণিগ্রহণার্থী রাজকুমারগণের মধ্য হইতে নিজেরাই পতি নির্বাচন করিতেন।

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মতা হইয়া সুবর্ণ-রথে আরোহণ করিয়া পিতৃরাজ্য হইতে অতি দূরবর্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিতা কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধসভাসদকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে অনেক রাজসভায় যাইয়া রাজকুমারগণকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি বনের মধ্যে এক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এইসকল অরণ্যে পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত। সেখানে কোন জীবকে হত্যা করিতে দেখা যাইত না; এইজন্য সেখানে পশুগণ মানুষকে ভয় করিত না। এমন কি—সরোবরের মৎসকুল পর্যন্ত মানুষের হাত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনি ও বৃদ্ধগণ সেখানে মৃগ ও পক্ষীদের মধ্যে আনন্দে বাস করিতেন। এমন কি—এই নির্বাসনের সময় কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। গার্হস্থ্যজীবনে যখন আর সুখ পাইত না, তখন লোক এই সকল অরণ্যে গিয়া বাস করিত; সেখানে মুনিগণের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

দ্যুমৎসেন নামক জনৈক রাজা পূর্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি জরাগ্রস্থ ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণপূর্বক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ রাজা তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের সহিত এই

তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে অতি কঠোর তপস্যায় তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান।

সাবিত্রী অনেক রাজসভা দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী ঋষি-তপস্বিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ করিতেন যে, সম্রাটও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমের নিকট দিয়া যাইবার সময় ঋষি-মুনিগণকে পূজা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও ভারতে এই ঋষি-মুনিগণের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী ফলমূলভোজী চীরপরিহিত কোন ঋষির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। আমরা সকলেই সেই ঋষির বংশধর। এইরূপেই ভারতে ধর্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে; অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী ঋষিগণকে পূজা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। আর যদি তাঁহারা রথারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে রথ ও বর্মাদি বাহিরে রাখিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শমগুণসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধারই আশ্রমে প্রবেশাধিকার ছিল না।

এইরূপে সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজতপস্বী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দর্শন করিলেন। সত্যবানকে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত রাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কোন রাজকুমার তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারেন নাই। এখানে অরণ্যাবাসে রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান তাঁহার হৃদয় হরণ করিলেন।

সাবিত্রী পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 'বৎসে সাবিত্রী, তুমি তো নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিলে; বল দেখি, তুমি কোথাও এমন কাহাকেও দেখিয়াছ কি, যাহার সহিত তুমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর? বল মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া বল।' তখন সাবিত্রী লজ্জানম্রবদনে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পিতা, দেখিয়াছি।' পিতা কহিলেন, ' বৎসে, যে রাজকুমার তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাহার নাম কি?' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'তাঁহাকে ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যায় না, কারণ তাঁর পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও রাজ্যের অধিকারী নহেন, তিনি তপস্বিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটীরবাসী বৃদ্ধ জনক-জননীর সেবায় নিরত রহিয়াছেন।'

সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রীর পতি-নির্বাচন-বৃত্তান্ত বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, 'এই নির্বাচন বড়ই অশুভ হইয়াছে।' কথাগুলি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান নিজ কর্মানুসারে দেহত্যাগ করিবে।' নারদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে রাজা কন্যাকে বলিলেন, 'সাবিত্রী, শুনিলে তো, অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান দেহত্যাগ করিবে; অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে, একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না, এরূপ অল্পায়ু আসন্নমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোনমতে বিবাহ হইতে পারে না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'পিতঃ, সত্যবান অল্পায়ুই হউক বা আসন্নমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতি অনুরাগী, আমি মনে মনে সেই সাধুচরিত্র বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি অন্য ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ করিতে আমাকে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবারে সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহার মনে

কখনও স্থান দেওয়া উচিত নহে।' রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়, তখন তিনি এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিতা হইয়া তাঁহার মনোনীত পতির সহিত বাস করিবার জন্য ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার জন্য পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে অরণ্যমধ্যে তাঁহাদের আশ্রমে গমন করিলেন।

নারদের মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্ দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা সত্যবানের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। সত্যবান প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন। সাবিত্রী রন্ধনাদি গৃহকার্য করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল, অবশেষে সত্যবানের দেহত্যাগের দিন নিকটবর্তী হইল। তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। উপবাসে থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া তিনি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই তিন রাত্রি তিনি পতির আসন্ন মৃত্যুচিন্তা করিয়া কত গভীর দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন, দেবতার নিকট পতির শুভকামনায় কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

অবশেষে সেই কালদিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সেদিন আর সাবিত্রীর—পতিকে এক মুহূর্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে সাহস হইল না। অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময় সাবিত্রী সেদিন পতির সঙ্গে যাইতে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনুমতি লাভ করিয়া সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে গেলেন। হঠাৎ সত্যবান বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন, 'প্রিয়া সাবিত্রী, আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল অবসন্নবোধ হইতেছে, আমার সর্বশরীর যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে, আমি কিছুকাল তোমার পার্শ্বে বিশ্রাম করিব।' সাবিত্রী ভয়বিজড়িত ও কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, 'প্রভো, আপনি আমার অঙ্কদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করুন।' তখন সত্যবান নিজ উত্তপ্ত মস্তক সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন

করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস উপস্থিত হইল, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রুলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সাবিত্রী যেখানে পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে পারিল না। তাহারা দেখিল সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নির গণ্ডী রহিয়াছে, যমদূতগণের মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না, সাবিত্রীর সান্নিধ্য হইতে পলাইয়া গিয়া তাহারা যমরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে না পারার কারণ নিবেদন করিল।

তখন মৃত ব্যক্তিগণের বিচারক মৃত্যুদেবতা যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস—পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্তী মৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। মৃত্যুর পর কাহাকে পুরস্কার অথবা কাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, তিনি তাহা বিচার করেন। সেই যমরাজ এখন স্বয়ং আসিলেন। অবশ্য যমরাজ দেবতা, অতএব সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই অগ্নির ভিতরে অনায়াসে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মা, তুমি এই শব দেহ পরিত্যাগ কর। কারণ, জানিও মর্ত্যমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়, ইহাই বিধির বিধান। মর্ত্যগণের মধ্যে আমিই প্রথম মরিয়াছি, তারপর হইতে সকলকেই মরিতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।' যমরাজ এই কথা বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকের জীবাত্মাকে লইয়া স্বীয় পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর কাহার পদশব্দ হইতেছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখেন—সাবিত্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মা সাবিত্রী, বৃথা কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল মর্ত্যজনেরই অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।' সাবিত্রী বলিলেন, 'পিতঃ, আমি আপনাকে অনুসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন বলিলেন, মর্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, সেইরূপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার প্রিয় পতির অনুসরণ করিয়া

থাকে, আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা ভার্যাকে কখনও তাহার পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।' তখন যমরাজ বলিলেন, 'বৎসে, তোমার বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনর্জীবন ব্যতীত আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'হে প্রভু যমরাজ, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাঁহার চক্ষু লাভ করেন ও সুখী হইতে পারেন।' যম বলিলেন, 'প্রিয় বৎসে, আমি ধর্মজ্ঞ, তোমার এই ধর্মসঙ্গত বাসনা পূর্ণ হউক।' এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের জীবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি পূর্ববৎ আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আবার সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎসে সাবিত্রী, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসিতেছ?' সাবিত্রী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, পিতা, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসিতেছি বটে। আমি যে না আসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ফিরিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, সুতরাং যেখানে আমার স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, সেখানে আমার দেহও যাইতেছে। আমার আত্মা তো পূর্বেই গিয়াছে—কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং আপনি যখন আমার আত্মাকে লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা না গিয়া কি করিয়া থাকিবে?' যম কহিলেন, 'সাবিত্রী, আমি তোমার বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম। আমার নিকট হইতে তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর একটি বর প্রার্থনা কর।' সাবিত্রী কহিলেন, 'দেব, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করি যে, আমার শ্বশুর যেন তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও ঐশ্বর্য ফিরিয়া পান।' যম কহিলেন, 'প্রিয় বৎসে, তোমায় এই বরও দান করিলাম। কিন্তু এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কারণ জীবিত মানুষ কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে না।' এই বলিয়া যম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বারংবার সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন, তথাপি সেই নম্রস্বভাবা পতিপরায়ণা সাবিত্রী তাঁহার মৃত স্বামীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া

বলিলেন, 'হে সাবিত্রী, হে মহানুভবে, তুমি এরূপ তীব্র শোক বিহ্বল হইয়া পাগলের মত স্বামীর অনুসরণ করিও না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার মনের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমি সেখানেই তাঁহার অনুসরণ করিব।' যম বলিলেন, 'আচ্ছা সাবিত্রী, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে; তাহা হইলেও কি তুমি তোমার পতির সহিত যাইতে প্রস্তুত?' পতির প্রতি পরম অনুরাগিণী সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার পতি যেখানে যাইবেন—জীবন হউক, মৃত্যু হউক, স্বর্গ হউক, নরকই হউক—আমি পরমানন্দে সেখানে যাইব।' যম কহিলেন, 'বৎসে তোমার কথাগুলি অতি মনোহর ও ধর্মসঙ্গত, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আর একটি বর প্রার্থণা কর, কিন্তু জানিও মৃত ব্যক্তি কখনও আবার জীবিত হয় না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'যদি আমার উপর আপনি এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমায় এই বর দান করুন, যেন আমার শ্বশুরের রাজবংশের লোপ না হয়, যেন সত্যবানের পুত্রগণ তাঁহার রাজ্য লাভ করে।' তখন যমরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'বৎসে, তোমার মনস্কামনা সফল হউক, এই তোমার পতির জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিলাম। তোমার পতি আবার জীবিত হইবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে তাহারা রাজপদ লাভ করিবে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্বে কোন নারী পতিকে এমন ভালবাসে নাই, আর আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাও অকপট অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট পরাজিত হইলাম।'

সাবিত্রী-উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়—মৃত্যুও যে সাবিত্রীর প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল, যে সাবিত্রী ঐকান্তিক প্রেমবলে যমরাজের নিকট হইতেও স্বীয় স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত শত শত মনোহর উপাখ্যানে পূর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের মধ্যে মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং প্রায় লক্ষশ্লোকে পূর্ণ।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল আখ্যানের সূত্র আবার ধরা যাউক। পাণ্ডবগণ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন, এই অবস্থায় আমরা পাণ্ডবদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেখানেও তাঁহারা দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাপ্রসূত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবারে মুক্ত হন নাই, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও দুর্যোধন কখনই তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য হয় নাই।

অরণ্যে বাসকালে পাণ্ডবগণের একদিনের ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাঁহারা বড়ই তৃষ্ণার্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি দ্রুতপদে যাইয়া অনেক অন্বেষণের পর একস্থানে একটি অতি নির্মলসলিল সরোবর দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন জলপানের জন্য সরোবরে অবতরণ করিবেন, শুনিলেন—কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, ' বৎস, জল পান করিও না। অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে যত ইচ্ছা জল পান করিও।' কিন্তু সহদেব অতিশয় তৃষ্ণার্ত থাকাতে এই বাক্য গ্রহণ না করিয়া ইচ্ছামত জলপান করিলেন, জলপান করিবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সহদেবকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে তাহার সন্ধানে ও জল আনয়নের জন্য পাঠাইলেন।

নকুল ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে উক্ত সরোবরের সমীপে যাইয়া ভ্রাতা সহদেবকে মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। নকুল তৃষ্ণার্ত থাকায় জলের দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনিও সহদেবের মত শুনিলেন, 'বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পশ্চাতে জল পান করিও।' তিনিও ঐ বাক্য অমান্য করিয়া জল পান করিলেন ও জল পান করিয়াই সহদেবের মত মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পরে অর্জুন ও ভীম ঐরূপে ভাতৃগণের অন্বেষণে ও জল আনিবার জন্য প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহ ফিরিলেন না। তাঁহাদেরও নকুল সহদেবের মত অবস্থা হইল। তাঁহারাও জল পান করিয়া

প্রাণত্যাগ করিলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ শোকভারাক্রান্ত হইল, তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন; সেই সময় হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'বৎস, দুঃসাহস করিও না। আমি একজন যক্ষ—বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস খাইয়া জীবনধারণ করি এবং এই সরোবরে বাস করি; এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমার দ্বারাই তোমার ভ্রাতারা প্রেতলোকে নীত হইয়াছে। হে রাজন্, যদি তুমিও তোমার ভ্রাতাদের মত আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান কর, তবে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্শ্বে পঞ্চম শবরূপে তোমাকেও শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া স্বয়ং যথেচ্ছা জল পান কর ও অন্যত্র লইয়া যাও।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি আপনার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন।' তখন যক্ষ তাহাকে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরও প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিমাশ্চর্যম্?'—জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার কি? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেনঃ

প্রতিমুহূর্তে আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে যে, তাহারা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার—মৃত্যু অহরহঃ সম্মুখে থাকিলেও কেহ বিশ্বাস করে না যে, সে মরিবে।২

যক্ষের আর এক প্রশ্ন ছিল, 'কঃ পন্থাঃ?'—কোন্ পথ অনুসরণ করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়? যুধিষ্ঠির ঐ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করিলেনঃ

তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ, জগতে নানা মত-মতান্তর রহিয়াছে। বেদও নানাবিধ—উহার এক ভাগ যাহা বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ

করিতেছে। এমন দুই জন মুনি বাহির করিতে পারা যায় না, যাঁহাদের পরস্পরের মতভেদ নাই। ধর্মের রহস্য যেন গুহায় নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।৩

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'হে রাজন্, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বকরূপী ধর্ম। আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই মরে নাই। আমার মায়াবলেই তাহারা মৃত প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভরতর্ষভ, তুমি যখন ধনলাভ ও সম্ভোগ অপেক্ষা অনৃশংসতাকে মহত্তর বিবেচনা করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতৃবর্গ জীবিত হউক।' এই কথা বলিবামাত্র ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যক্ষের প্রশ্নগুলির উত্তর হইতে আমরা দেখিতে পাই, রাজার ভাব অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে অধিক ছিল।

এদিকে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশ বর্ষ নিকটবর্তী হইতেছিল। এই কারণে যক্ষ তাঁহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেই রূপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর তাঁহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটাইলেন এবং বিরাটরাজ্যে গমন করিয়া সেখানে রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দ্যূতজ্ঞ সভাসদ্ হইলেন। ভীম পাচকের কাজে নিযুক্ত হইলেন। অর্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীতশিক্ষার শিক্ষক হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। নকুল রাজার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব গোশালার তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে পরিচারিকারূপে গৃহীতা হইলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ এক বৎসর নিরাপদে অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত করিলেন। দুর্যোধন তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান

করিল, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হইতে পারিল না। বর্ষ পূর্ণ হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তাঁহাদের সন্ধান পাইল।

এইবার যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূত ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ অর্ধরাজ্যের অধিকারী; অতএব তাঁহাদিগকে যেন এক্ষণে অর্ধরাজ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ পোষণ করিত, সুতরাং সে কিছুতেই পাণ্ডবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইল না। পাণ্ডবেরা রাজ্যের অতি অল্পাংশ একটি প্রদেশ, এমন কি পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন, বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব দুর্যোধন বলিল যে, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে দেওয়া হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্য দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কৃষ্ণও কৌরবসভায় গিয়া এই আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি কৌরবরাজসভার বৃদ্ধগণ দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়ই এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল। এক দিকে যুধিষ্ঠির, অপর দিকে দুর্যোধন—উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, যাঁহার অনুরোধ প্রথম পৌঁছিবে, ধার্মিক ক্ষত্রিয়কে তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন রাজা ও যোদ্ধৃবর্গ অনুরোধের পৌর্বাপর্য অনুসারে পাণ্ডব ও কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা এক পক্ষে, পুত্র হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা এক পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত ছিল। সারাদিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যা হইলে যখন যুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর শত্রুভাব থাকিত না, এমন কি এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্যন্ত যাতায়াত করিত।

প্রাতঃকাল হইলেই কিন্তু তাহারা আবার পরস্পর যুদ্ধ করিত। মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের সময় পর্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। আবার প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা কেহ কখনও যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি আছে, শত্রুরও ঠিক সেইগুলি না থাকিলে তাহাকে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। মোট কথা কোন প্রকারে শত্রুর কোন ছিদ্র থাকিলে তাহার অবৈধ সুযোগ লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। যদি কেহ এই সকল যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করিতেন, তবে তিনি ঘোর অপযশের ভাগী হইতেন, তাঁহার সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইবার যো থাকিত না। তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ শিক্ষা পাইতেন। যখন মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, তখনও হিন্দুরা তাঁহাদের আক্রমণকারীদের প্রতি সেই শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রতিবারই পরাজয়ের পর উপহারাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধিই ছিল যে, অপরের দেশে কখনও বলপূর্বক অধিকার করিবে না, আর কেহ পরাস্ত হইলে তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুসলমানবিজেতৃগণ কিন্তু হিন্দুরাজগণের উপর অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহাদিগকে হাতে পাইলে বিনা বিচারে তাঁহাদের প্রাণনাশ করিতেন।

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন সে কেবল সাধারণ ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে; তখন দৈবাস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। এই দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এইরূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তি দশলক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণবৃষ্টি হইবে—এই মন্ত্রশক্তিবলে, দৈবশক্তিবলে চারিদিকে

বজ্রপাত হইবে, যে কোন জিনিষ দগ্ধ করিতে পারা যাইবে, নানা অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত—উভয় মহাকাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, এইসব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই। কামান খুব প্রাচীন জিনিষ। চীনা ও হিন্দুরা উভয়েই উহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের নগরসমূহের প্রাচীরে লৌহনির্মিত শূন্যগর্ভ নলনির্মিত শত শত অদ্ভুত অস্ত্র থাকিত। লোকে বিশ্বাস করিত, চীনারা ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা শয়তানকে এক শূন্যগর্ভ লৌহনালীর ভিতর প্রবেশ করাইত, আর একটি গর্তে একটু অগ্নি সংযোগ করিলেই শয়তান ভয়ঙ্কর শব্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসংখ্য লোকের বিনাশ সাধন করিত।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া একজনের যেমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পাঠ করা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের যুদ্ধের জন্য নানাবিধ কৌশল-অবলম্বন, ব্যূহ-রচনা, বিভিন্ন প্রকার সৈন্যবিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পাঠ করা যায়। চারিপ্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে—পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে শেষ দুইটির ব্যবহার নাই। কিন্তু সে সময় উহাদের বিশেষ প্রচলন ছিল। শত সহস্র হস্তী, তাহাদের আরোহীর সহিত লৌহবর্মাদিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীরূপে গঠিত হইত—এই হস্তীসৈন্যকে শত্রুসৈন্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তারপর অবশ্য রথের খুব প্রচলন ছিল। আপনারা সকলেই প্রাচীন রথের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীনকালে এই রথের ব্যবহার ছিল।

কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষই, কৃষ্ণ যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে আসিয়া যোগ দেন, তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তবে তিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিতে রাজী হইলেন, আর দুর্যোধনকে নিজ অজেয় নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন।

এইবার কুরুক্ষেত্রের সুবৃহৎ ভূভাগে অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ, উভয় পক্ষেরই আত্মীয়স্বজনগণ এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর নিহত হইলেন। এমন কি উভয় পক্ষের মিলিত যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য

ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর যুদ্ধের অবসান হইল; পাণ্ডবরা জয়লাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী এবং অন্যান্য নারীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে সকলে কিছু পরিমাণে শান্ত হইলে মৃত বীরগণের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ, যাহা 'ভগবদ্গীতা' অপূর্ব ও অমর কাব্যরূপে জগতে পরিচিত। ভারতে ইহাই সর্বজনপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় শাস্ত্র, আর ইহাতে যা উপদেশ আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণার্জুনের যে কথোপকথন হয়, তাহাই 'ভগবদ্গীতা' নামে পরিচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ঐ গ্রন্থ আপনাদের দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি আপনারা জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমার্সন যে উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যদি জানিতে চান, তবে শুনুন—তাহা এই গীতা। তিনি একবার ইংলণ্ডে কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কার্লাইল তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন—কংকর্ডে৪ যে উদার দার্শনিক তত্ত্বের আন্দোলন আরম্ভ হয়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাহার মূল। আমেরিকায় উদার ভাবের যত প্রকার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোনরূপে সেগুলি ঐ কংকর্ড-আন্দোলনের নিকট ঋণী।

গীতার মূল বক্তা কৃষ্ণ। আপনারা যেমন ন্যাজারেথবাসী যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ বহু অবতারে তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসক একটি সম্প্রদায়ও আছে। অন্যান্য অবতারের উপাসক অপাক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণই অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখঃ তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং

গৃহীদের সুখে দুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল না; কি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখঃ তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে সর্ব অবস্থাতেই আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছেন, আর তিনি যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থাকিয়াও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহাকর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য বুঝিয়াছেন।৫

ইহা কিরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায় অনাসক্তি। সব কাজ কর, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিও না। তুমি সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুন, ধনবান্ হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, মানযশ সকল সম্বন্ধেই এই কথা। ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে, ইহাদের প্রতি যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্, আর কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনের জন্য কার্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের ভাল করুন, যদি প্রয়োজন হয় তাহাদের জন্য শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন উক্ত উপদেশের যথার্থ উদাহরণস্বরূপ ছিল।

স্মরণ রাখিবেন—যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন, আর তাঁহার জীবনের কতক অংশ প্রায় ন্যাজারেথবাসী যীশুর মত। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংস নামক এক অত্যাচারী রাজা ছিল। আর কংস দৈববাণী-শ্রবণে অবগত হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহার নিধনকর্তা জন্মগ্রহণ করিবেন। উহা শুনিয়া সে নিজ অনুচরবর্গকে সকল পুরুষ-শিশু হত্যা করিবার আদেশ দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও

কংসকর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—সেই কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় কারাগার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নবজাত শিশু বলিয়া উঠিল, 'আমিই সমস্ত জীব-জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' আবার কৃষ্ণকে রূপকচ্ছলে ব্রজগোপাল বলা হইয়াছে, তাঁহার একটি নাম 'রাখালরাজ'। সাক্ষাৎ ভগবান্ নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে জানিতে পারিয়া ঋষিরা তাঁহার পূজার জন্য উপস্থিত হইলেন। উভয়ের জীবনলীলার অন্যান্য অংশে আর কোন সাদৃশ্য নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণই এই অত্যাচারী কংসকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও স্বয়ং সিংহাসন আরোহণ করিবার কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্তব্য বলিয়াই ঐ কার্য সম্পদান করিয়াছিলেন; উহার ফলাফল লইয়া বা উহাতে নিজের কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে—এই বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা উঠে নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—যিনি আঠার দিনের মধ্যে দু-দশ দিন যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় শরশয্যায় শয়ান ছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, দানধর্ম, বিবাহবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব এবং ঋষি দেবতা ও প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিংবদন্তী বিবৃত করিলেন। মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভীষ্মের এই উপদেশে পূর্ণ; ইহা হিন্দুগণের ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ। ইতোমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তাঁহার হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। এক্ষণে ব্যাসের উপদেশানুসারে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যুদ্ধাবসানে পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের

সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া নিজ পতিব্রতা মহিষী ও পাণ্ডবগণের মাতা কুন্তীর সহিত শেষ জীবনে তপস্যার জন্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর ছত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে একদিন সংবাদ আসিল–পাণ্ডবদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, আচার্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বশ্রুত শোকসংবাদই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন–আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া মহাপ্রস্থানের জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন। মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্ন্যাসবিশেষ। প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হইতেন। জীবনের সকল মায়া কাটাইয়া পানাহারবর্জিত অবস্থায় যে পর্যন্ত না দেহপাত হয়, সে পর্যন্ত কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ের দিকে চলিতে হয়; এইরূপে চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তারপর দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াসমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্বত। সুমেরু পর্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। সেখানে দেবগণ বাস করেন। কেহ কখনও সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্মিণী দ্রৌপদী স্বর্গগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বল্কল পরিধান করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে একটি কুকুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে বরফের উপর দিয়া চলিতেছেন,

এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, 'রাজন্, দেখুন, রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন।' যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল বলিলেন, 'আমরা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।' কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, 'দেখুন, দেখুন আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।' রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, 'চল, চল, অগ্রসর হও।'

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জুন ও ভীম একে একে পড়িলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তখন একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুকুরটি তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে তখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐ কুকুরের সহিত হিমানীস্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অবশেষে সুমেরু পর্বতে উপনীত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, দেবগণ এই ধার্মিক রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র তোমাকেই সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।' কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আমি আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।' তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'তাঁহারা পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।'

এখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারী সেই কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।' ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্, আপনি এ কি বলিতেছেন! কুকুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুকুরটাকে আপনি ত্যাগ করুন। কুকুর কখনও স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি পাগল হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল

সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী।' তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য; কিন্তু এই কুকুরটি হিমানীস্তূপ-লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বারবার আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষীরও প্রাণ গেল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই কুকুরটিই আমায় ত্যাগ করে নাই। আমি এখন উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?' ইন্দ্র বলিলেন, 'কুকুর-সঙ্গী মানুষের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুকুরটি পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কুকুরটি আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গসুখ-সম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিব না।' তখন ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজন্, আপনার শরণাগত কুকুরটি স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কাজ করুন। আপনি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, আর ওই কুকুর অশুচি—প্রাণিহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ; কুকুরটা পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জন করিয়াছেন, তাহা এই কুকুরের সহিত বিনিময় করিতে পারেন।' রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুকুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গে গমন করুক।'

যুধিষ্ঠির এই বাক্য বলিবামাত্র পট-পরিবর্তন হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, সেখানে কুকুর নাই, তাহার স্থানে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যম বর্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, আপনার ধর্ম পরীক্ষার জন্য কুকুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একটা সামান্য কুকুরকে নিজের পুণ্যার্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্য নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আপনার মত নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ, আপনার জন্ম দ্বারা পৃথিবী ধন্য হইয়াছে। সর্বপ্রাণীর প্রতি আপনার গভীর অনুকম্পা—এইমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন।

হে রাজন্‌, আপনি নিজধর্মবলে ঐ সকল লোক অর্জন করিয়াছেন, আপনার দিব্য পরমপদ লাভ হইবে।'

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র ধর্ম ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে আবার প্রথমে তাঁহার আরও কিছু পরীক্ষা হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর দেবদেহপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল, তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইরূপে মহাভারত উচ্চভাবদ্যোতক কবিতায় 'ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়' বর্ণনা করিয়া এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভাবান্‌ ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষের উন্নত ও মহিমময় চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারিলাম না। ধর্মভীরু অথচ দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম ও ন্যায়, অপরদিকে পুত্রবাৎসল্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহান্‌ ধর্মভাব, অপর চারি পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র, যাহাতে একদিকে মহাশৌর্যবীর্য—অপর দিকে সর্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ; মানবীয় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র, এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা ভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীদের চরিত্র—যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে কম উজ্জ্বল নহে—এই কাব্যের এই সকল এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজগতের সযত্নে রক্ষিত জাতীয় সম্পত্তি, এবং তাঁহাদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে আদর্শ

চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

৩. জড়ভরতের উপাখ্যান

[ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

প্রাচীনকালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে ‘ইণ্ডিয়া’ নামে অভিহিত করেন, তাহা ঐ দেশের অধিবাসিগণের নিকট ‘ভারতবর্ষ’ নামে পরিচিত। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য-সন্তানকেই সে-যুগে সংসার ছাড়িয়া, নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমস্ত ভার ঐশ্বর্য ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ—আত্মার চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে হইত; এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, ভৃত্যই হউন, পুরুষই হউন বা নারীই হউন, এই কর্তব্য হইতে কেহই অব্যাহতি পাইত না। কারণ—পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি রূপে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্তব্যগুলি সেই এক চরম অবস্থায় পৌঁছিবার সোপান মাত্র, যে অবস্থায় মানুষের জড়বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময় যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি সুবর্ণরজতখচিত মর্মরপ্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার পানপাত্র নানাবিধ রত্নমণ্ডিত ছিল, তিনি হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনীতীরে কুশ ও তৃণদ্বারা সহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্যবর্তমান, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ-মননই তাঁহার একমাত্র কার্য হইল।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় এক হরিণী জল পান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটি সিংহ প্রবল গর্জন করিয়া

উঠিল। হরিণী এত ভীত হইল যে, পিপাসা দূর না করিয়াই নদী পার হইবার জন্য এক উচ্চ লম্ফ প্রদান করিল। আসন্নপ্রসবা হরিণী এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়ায় এবং লম্ফপ্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ একটি শাবক প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। হরিণশাবকটি জন্মিয়াই জলে পড়িয়া গেল; নদীর খরস্রোত তাহাকে দ্রুত একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাজার দৃষ্টি সেইদিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উঠিয়া হরিণশাবকটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। করুণাহৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণশিশুটির লালনপালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, প্রত্যহ তাহার জন্য সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সংসারত্যাগী রাজর্ষির পিতৃসুলভ যত্নে হরিণশিশুটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সে একটি সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজের মনের বলে পরিবার রাজ্যসম্পদ অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্যের উপর চিরজীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনি এখন নদী হইতে বাঁচান মৃগশিশুর উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অসমর্থ হইলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটির ফিরতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাজর্ষির মন তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন—আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটিকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছে, হয়তো বা তাহার অন্য কোনপ্রকার বিপদ হইয়াছে, তাহা না হইলে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিবিষ্ট না হইয়া হরিণটির চিন্তা করিতেছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটির কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণ-ভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ-দেহ হইল। কিন্তু কোন কর্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে-সকল মহৎ ও শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহারও ফল ফলিল। যদিও তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পশু-শরীরে বাস

করিতেছিলেন, তথাপি তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্বজন্মের সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে যাইতেন; সেখানে প্রত্যহ যোগ, হোম ও উপনিষদ্ আলোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরজন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর হইলেন, সুতরাং পূর্ববৃত্তান্ত সর্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের ভালমন্দে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিতেন না; পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন—এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্বদা নিমগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনযাপন করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতৃ-সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহারা ঐ সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড়প্রকৃতি ও অকর্মণ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকুমাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহধারণের উপযোগী আহারমাত্র দিতেন। ভ্রাতৃজায়াগণ সর্বদাই তাঁহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত করিতেন; আর যদি তিনি তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটি কথাও বলিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেন, ও তাঁদের ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভবে গৃহে ফিরিতেন।

একদিন জড়ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে তিনি গৃহের বাইরে গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই দেশের রাজা শিবিকারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন শিবিকা-বাহক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন রাজার অনুচরবর্গ তাহার স্থানে শিবিকাবাহন-কার্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল; অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ভরতকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তাহাকে সবল যুবাপুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে; তুমি তাহার পরিবর্তে রাজার শিবিকা বহন করিতে রাজী আছ?' ভরত তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। রাজার অনুচরগণ দেখিল এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট; অতএব তাহারা তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মূর্খ, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনাবোধ হইয়া থাকে, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনাবোধ হইয়া থাকে, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্।' তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ হে রাজন্, কাহাকে আপনি মূর্খ বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে, বলিতেছেন? কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্, 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড– দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহ যেমন পঞ্চভূতনির্মিত, এই দেহও তেমনি। আর দেহটা তো অচেতন, জড়; ইহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি 'মন' আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও তো তাহাই–উহা তো সর্বব্যাপী। আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো ইহা সেই আত্মা– আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা আপনাতে যেমন, আমাতেও তেমনি; জগতের মধ্যে ইহা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব। রাজন্ আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও আহত হইতে

পারেন? হে রাজন্, অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা আমার এই দেহটার ছিল না, তাই যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, সেজন্য এইভাবে সাবধান হইয়া চলতেই শিবিকার গতি বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা তো কখনও ক্লান্তি অনুভব করে না, দুর্বলতা বোধ করে না; কারণ আত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন।

রাজা পূর্বে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য গর্বিত ছিলেন, তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকাবাহন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেজন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।' ভরত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পূর্ববৎ নিজের ভাবে নীরবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

৪. প্রহ্লাদ-চরিত্র

[ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। দেব ও দৈত্য উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও সর্বদাই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর মানব-প্রদত্ত যজ্ঞভাগে অথবা পৃথিবীর শাসন ও পরিচালন-ব্যাপারে দৈত্যগণের অধিকার ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও তাঁহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসন অধিকার করিতেন এবং কিছুকালের জন্য পৃথিবী শাসন করিতেন। তখন দেবগণ সমগ্র জগতের প্রভু সর্বব্যাপী বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনিও তাহাদিগকে উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। দৈত্যগণ পরাস্ত ও বিতাড়িত হইলে দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেন।

পূর্বোক্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে তাঁহার জ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুগণের বাসস্থান মর্ত্যলোক, দেব ও দেবতুল্য ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গলোক এবং দৈত্যগণের বাসস্থান পাতাল শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু নিজেকে সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ঈশ্বর নাই, আর চারিদিকে আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোন স্থানে কেহ যেন বিষ্ণুর উপাসনা না করে, এখন হইতে সমুদয় পূজা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত। অতি শৈশবেই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার নিজগৃহে যদি সেই উপাসনা প্রবেশ করে, তবে তো সর্বনাশ, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র

প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন কঠোরশাসনক্ষম শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে, প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত কখনও শুনিতে না পায়। শিক্ষকদ্বয় সেই রাজপুত্রকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণের সহিত রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না হইয়া সর্বদা অপর বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনাপ্রনালী শিখাইতে নিযুক্ত রহিলেন। শিক্ষকগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, তাঁহারা প্রবলপ্রতাপ রাজা হিরণ্যকশিপুকে অতিশয় ভয় করিতেন; অতএব তাঁহারা প্রহ্লাদকে এরূপ শিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনা ও তদ্বিষয়ক উপদেশ-দান প্রহ্লাদের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন নিজেদের দোষ-স্খালনের জন্য রাজার নিকট গিয়া এই ভয়ঙ্কর সমাচার নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পুত্র যে কেবল নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে তাহা নহে, অপর বালকগণকেও বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

রাজা ষণ্ড ও অমর্কের নিকট পুত্র সম্বন্ধে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে নিজসমীপে আহ্বান করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রহ্লাদকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, 'আমি দৈত্যরাজ, আমিই এখন ত্রিভুবনের অধীশ্বর, অতএব আমিই একমাত্র উপাস্য', কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হইল না। বালক বারবার বলিতে লাগিলেন, 'সমগ্র জগতের অধীশ্বর সর্বব্যাপী বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; আপনার রাজ্যপ্রাপ্তিও বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন; আর যতদিন বিষ্ণুর ইচ্ছা থাকিবে, ততদিনই আপনার রাজত্ব।' প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বধ করিবার জন্য নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়াই দৈত্যগণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এতদূর নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি শস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না।

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে, শস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না, তখন তিনি ভীত হইলেন। কিন্তু আবার দৈত্যজনোচিত অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বালককে বিনাশ করিবার নানাবিধ পৈশাচিক উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাহাকে হস্তীপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য– হস্তী তাহাকে পদতলে পিষিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যেমন লৌহপিণ্ডকে পিষিয়া ফেলা হস্তীর অসাধ্য, প্রহ্লাদের দেহও হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইল না। সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার এই উপায় বিফল হইল না।

পরে রাজা প্রহ্লাদকে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, তাঁহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে তৃণের উপর পতিত হয়, প্রহ্লাদও তদ্রূপ অক্ষতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য অতঃপর বিষপ্রয়োগ, অগ্নিসংযোগ, অনশনে রাখা, কূপে ফেলিয়া দেওয়া, অভিচার ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়– একটির পর একটি অবলম্বিত হইল; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং কিছুই তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

অবশেষে রাজা আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই নাগপাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হউক। তাহার উপর বড় বড় পাহাড় স্তূপাকার করিয়া দেওয়া হউক। এই অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক, তাহা হইলে এখনই না হয় কিছুকাল পরে সে মরিয়া যাইবে। কিন্তু পিতার আদেশে এই অবস্থায় পতিত হইয়াও প্রহ্লাদ ‘হে বিষ্ণু, হে জগৎপতে, হে সৌন্দর্যনিধে’ ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর চিন্তা ও তাঁর ধ্যান করিতে করিতে তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অতি নিকটে রহিয়াছেন; আরও চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অন্তর্যামী। অবশেষে তাঁহার অনুভব হইল যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল বস্তু এবং তিনিই সর্বত্র।

যেমন প্রহ্লাদের এইরূপ অনুভূতি হইল, অমনি তাঁহার নাগপাশ খুলিয়া গেল, তাঁহার উপর যে পর্বতরাশি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা গুড়াইয়া গেল, তখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিল ও তিনি ধীরে ধীরে তরঙ্গরাজির উপর উত্থিত হইয়া নিরাপদে সমুদ্রকূলে নীত হইলেন। তিনি যে একজন দৈত্য, তাঁহার যে একটি মর্ত্যদেহ আছে, প্রহ্লাদ তখন এ-কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ– ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইতেছে। জগতে এমন কিছু নাই–যাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে, তিনিই সমগ্র জগতের–সমগ্র প্রকৃতির শাস্তাস্বরূপ। এই উপলব্ধি-বলে প্রহ্লাদ সমাধিজনিত অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দে নিমগ্ন রহিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার দেহজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, তিনি নিজেকে প্রহ্লাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। দেহ সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়াই তিনি দেখিতে লাগিলেন, ভগবান্ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র রহিয়াছে। তখন জগতের সকল বস্তুই তাঁহার বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, তাঁহার শত্রু ভগবান্ বিষ্ণুর পরমভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য অবলম্বিত সকল উপায়ই বিফল হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ পুনরায় পুত্রকে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর দিতেন, এখনও সেই একই উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, শিক্ষা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার শিশুজনোচিত এসব খেয়াল চলিযা যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্কের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। ষণ্ড ও অমর্ক তদনুসারে প্রহ্লাদকে রাজধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উপদেশ প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, প্রহ্লাদ নিজ সহপাঠী দৈত্যবালকগণকেও বিষ্ণুভক্তি শিখাইতেছেন, তখন তিনি আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেন এবং বিষ্ণুকে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, 'বিষ্ণু সমগ্র জগতের অধীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।' এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জন গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রে দুষ্ট, যদি তোর বিষ্ণু সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি এই স্তম্ভে নাই কেন?' প্রাহ্লাদ বিনীতভাবে বলিলেন, 'হাঁ, অবশ্যই তিনি এই স্তম্ভে আছেন।' তখন হিরণ্যকশিপু বলিলেন, 'আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি তোকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিতেছি, তোর বিষ্ণু তোকে রক্ষা করুক।' এই বলিয়া দৈত্যরাজ তরবারিহস্তে প্রহ্লাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তম্ভের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে বজ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইল, নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে বিষ্ণু নির্গত হইলেন। সহসা এই ভীষণ মূর্তি দর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগবান্ নৃসিংহ কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও ভগবান্ নৃসিংহদেবের চরণে পতিত হইয়া পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, 'বৎস প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।' প্রহ্লাদ ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, 'প্রভো, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, এক্ষণে আমার আর কি প্রার্থনা থাকিতে পারে? আপনি আর আমাকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইবেন না।' ভগবান্ পুনরায় বলিলেন, 'প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কাম ভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তথাপি আমার দর্শন বৃথা হয় না। অতএব আমার নিকট যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।' তখন প্রহ্লাদ বলিলেনঃ

অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ্য বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইরূপ গভীর অনুরাগ আমার হৃদয়ে থাকে, হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।৬

তখন ভগবান্ বলিলেন, ‘বৎস প্রহ্লাদ, যদিও আমার পরম ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোনরূপ কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি তুমি আমার আদেশ সর্বদা আমাতে মন রাখিয়া কল্পান্ত পর্যন্ত পৃথিবী ভোগ কর ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান কর। যথাসময়ে কল্পান্তে দেহপাত হইলে আমাকে লাভ করিবে।’ এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে দৈত্যদের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া স্ব-স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

৫. জগতের মহত্তম আচার্যগণ

[১৯০০ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুআরী প্যাসাডেনা সেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা]

হিন্দুদের মতানুসারে এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্য সমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গগতিতে চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতিসমূহ উঠিতেছে আবার পড়িতেছে, উত্থানের পর পতন হইতেছে; ঐ পতনের পর আবার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিতে পুনরুত্থান হইয়া থাকে। এইরূপ তরঙ্গগতি সর্বদা চলিতেছে। ধর্মজগতেও এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ উত্থান পতন ঘটিয়া থাকে। জাতিবিশেষের অধঃপতন হইল, বোধ হইল যেন উহার জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঐ জাতি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নববলে বলীয়ান্ হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে, তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়। সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্বদাই দেখা যায়—ঐ তরঙ্গের শীর্ষে ঈশ্বরের একজন বার্তাবহ স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। একদিকে তাঁহারই শক্তিতে সেই তরঙ্গের—সেই জাতির অভ্যুত্থান, অপরদিকে আবার যে-সকল শক্তি হইতে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনি সেগুলিরই ফলস্বরূপ; উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং তাঁহাকে এক হিসাবে স্রষ্টা বা জনক, অন্য হিসাবে সৃষ্ট বা জন্য বলা যাইতে পারে। তিনি সমাজের উপর তাঁহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার তাঁহার ঐরূপ হওয়ার কারণই হইল সমাজ। ইঁহারাই জগতের চিন্তানায়ক, প্রেরিতপুরুষ, জীবনের বার্তাবহ, ঈশ্বরাবতার।

মানুষের ধারণা, জগতে ধর্ম একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব, ধর্মাচার্য বা ঈশ্বরবতার একজন মাত্রই হইতে পারেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকেই যেন একটি—কেবল একটি ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট; সুরগুলির সমন্বয়েই ঐকতানের সৃষ্টি—কেবল একটি সুরে নহে। বিভিন্ন জাতির জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন জাতিই কখনও সমগ্র জগৎ ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন জাতিই সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, আমরাই কেবল সমগ্র জগতের—সমগ্র ভোগের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বিধাতানির্দিষ্ট এই জাতিসমূহের ঐকতানে প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই সমুদয়ের সমষ্টিই মহাসমন্বয়—মহা ঐকতানস্বরূপ।

জাতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এই সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই চিরকালের জন্য সমগ্র জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আসেন নাই। এপর্যন্ত কেহই কৃতকার্য হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না। মানবজাতির সমগ্র শিক্ষায় প্রত্যেকেরই দান একটি অংশ মাত্র। সুতরাং ইহা সত্য যে, কালে প্রত্যেক মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই আজন্ম ব্যক্তিনির্ভর ধর্মে (personal religion) বিশ্বাসী। আমরা সূক্ষ্ম আত্মা ও নানা মতামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক আচরণ, প্রত্যেক কার্যই দেখাইয়া দেয় যে, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই আমরা তত্ত্ববিশেষ ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ পুরুষবিশেষের চরিত্রের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়। আমরা কেবল দৃষ্টান্তসহায়েই উপদেশ বুঝিতে পারি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা সকলে এতদূর উন্নত হইতাম যে, তত্ত্ববিশেষের ধারণা করিতে আমাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন হইত না, তবে অবশ্য খুবই ভাল হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তবিক আমরা ততদূর উন্নত নহি। সুতরাং স্বভাবতই

অধিকাংশ মানব এই অসাধারণ পুরুষগণের, এই ঈশ্বরাবতারগণের—খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত এই অবতারগণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। মুসলমানরা গোড়া হইতেই এইরূপ উপাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রফেট বা ঈশ্বরদূত বা অবতারের উপাসনার বা তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের একেবারে বিরোধী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন প্রফেট বা অবতারের পরিবর্তে তাঁহারা সহস্র সহস্র সাধু-মহাপুরুষের পূজা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ ঘটনা অস্বীকার করিয়া তো আর কাজ করা চলে না। প্রকৃত কথা এই, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর এরূপ উপাসনা আমাদের পক্ষে হিতকর। তোমাদের অবতার যীশুখ্রীষ্টকে যখন লোকে বলিয়াছিল, 'প্রভু, আমাদিগকে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখান', তিনি তখন উত্তর দিয়াছিলেন, 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।' তাঁহার এই কথাটি তোমরা স্মরণ করিও। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁহাকে মানব ব্যতীত অন্যভাবে কল্পনা করিতে পারে? আমরা তাঁকে কেবল মানবীয় ভাবের মধ্য দিয়াই দেখিতে সমর্থ। এই গৃহের সর্বত্রই তো আলোকতরঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, তবে আমরা উহা দেখিতেছি না কেন? কেবল প্রদীপেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঈশ্বর সর্বব্যাপী, নির্গুণ, নিরাকার, তত্ত্ববিশেষ হইলেও আমাদের মনের বর্তমান গঠন এরূপ যে, কেবল নররূপধারী অবতারের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে—দর্শন করিতে পারি। যখনই মহাজ্যোতিষ্কগণের আবির্ভাব হয়, তখনই মানব ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমরা জগতে যেভাবে আসিয়া থাকি, তাঁহারা সেভাবে আসেন না। আমরা আসি ভিখারীর মত, তাঁহারা আসেন সম্রাটের মত। আমরা এই জগতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মত আসিয়া থাকি, যেন আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি—কোনমতে পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘুরিতেছি; আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা উপলব্ধি করিতে আমরা জানি না, বুঝিতে পারি না। আমরা আজ এইরূপ কাজ করিতেছি, কাল আবার অন্যরূপ করিতেছি। আমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত স্রোতে

ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি, বাত্যামুখে ছোট ছোট পালকের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি।

কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সকল বার্তাবহ আসিয়া থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের জীবনব্রত যেন আজন্ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, জন্ম হইতেই তাঁহারা যেন বুঝিয়াছেন ও স্থির করিয়াছেন, জীবনে কি করিতে হইতে হইবে। তাঁহাদের জীবনে কি কি করিতে হইবে, তাহা যেন তাঁহাদের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে; আর লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তাঁহারা সেই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী হইতে কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন না। ইহার কারণ এই, তাঁহারা নির্দিষ্ট কোন কার্য করিবার জন্যই আসিয়া থাকেন, তাঁহারা জগৎকে কিছু দিবার জন্য—জগতের নিকট কোন এক বিশেষ বার্তা বহন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও যুক্তি বা তর্ক করেন না। তোমরা কি কখনও এইসকল মহাপুরুষ বা শ্রেষ্ঠ আচার্যকে তাঁহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্ক করিতে শুনিয়াছ বা এইরূপ পড়িয়াছ? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও যুক্তি তর্ক করেন নাই। যাহা সত্য, তাহাই তাঁহারা সোজাসুজি বলিয়াছেন। কেন তাঁহারা তর্ক করিতে যাইবেন? তাঁহারা যে সত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেবল নিজেরাই দর্শন করেন না, অপরকেও দেখাইয়া থাকেন। যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর আছেন কিনা, আর আমি যদি উত্তরে বলি—'হ্যাঁ', তবে তখনই তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'আপনার ঐরূপ বলিবার কি যুক্তি আছে?'—আর তোমাদিগকে উহার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দিবার জন্য বেচারা আমাকে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তোমরা যীশুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে, 'ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি?' তিনিও উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ, আছেন বৈকি!' তারপর 'তাঁহার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, 'এই যে প্রভু সম্মুখেই রহিয়াছেন—তাঁহাকে দর্শন কর।' অতএব তোমরা দেখিতেছ, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই সকল মহাপুরুষের যে ধারণা, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল, উহা যুক্তিবিচারলব্ধ নহে। তাঁহারা আর অন্ধকারে পথ হাতড়ান না, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শনজনিত বলে বলীয়ান্। আমি সম্মুখস্থ এই টেবিলটি দেখিতেছি, তুমি শত শত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর যে, টেবিলটি নাই, তুমি কখনই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে

আমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ আমি উহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমার এই বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ় অচল, অটল, তাঁহাদের বিশ্বাসও—তাঁহাদের আদর্শের উপর, তাঁহাদের নিজ জীবনব্রতের উপর, সর্বোপরি তাঁহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাসও তদ্রূপ দৃঢ় ও অচল। এই মহাপুরুষগণ যেরূপ প্রবল আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, অপর কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তুমি কি পরলোক মানো? তুমি কি এই মত অথবা ঐ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর? কিন্তু মূলভিত্তিস্বরূপ সেই আত্মবিশ্বাসীই যে নাই। যে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না, সে আবার অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিবে, লোকে ইহা আশা করে কিরূপে? আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় নহি। এই একবার ভাবিতেছি—আমি নিত্যস্বরূপ, কিছুতে আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, আবার পরক্ষণেই আমি মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছি। এই ভাবিতেছি আমি অজর অমর, পরক্ষণেই হয়তো একটা ভূত দেখিয়া ভয়ে এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম যে, আমি কে, কোথায় রহিয়াছি, আমি মৃত কি জীবিত—সব ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবিতেছি—আমি খুব ধার্মিক, আমি খুব চরিত্রবান; পরমুহূর্তেই এমন এক ধাক্কা খাইলাম যে, একেবারে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইহার কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে, আমি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, আমার চরিত্রবলরূপ মেরুদণ্ড ভগ্ন।

কিন্তু এই সকল মহত্তম আচার্যের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের সকলের ভিতর এই একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারা সকলেই নিজের উপর অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন; এরূপ বিশ্বাস অসাধারণ, সুতরাং আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আর সেই কারণেই এই মহাপুরুষগণ নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, আর তাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশ সহস্র বিভিন্ন মতবাদ কল্পনা করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারি না, কাজে কাজেই আমরা যে তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারি না, ইহা স্বাভাবিক।

আবার তাঁহাদের এরূপ শক্তি যে, যখন তাঁহাদের মুখ হইতে কোন বাণী উচ্চারিত হয়, তখন জগৎ উহা শুনিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা কিছু বলেন, প্রত্যেক শব্দটি সোজা সরল ভাবে গিয়া লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, বোমার মত ফাটিয়া সম্মুখে যাহা কিছু থাকে, তাহারই উপর নিজের অসীম প্রভাব বিস্তার করে। যদি কথার পশ্চাতে শক্তি না থাকে, শুধু কথায় কি আছে? তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলিতেছ, কিরূপেই বা তোমার ভাষার শব্দবিন্যাস করিতেছ, তাহাতে কি আসে যায়? কিন্তু ব্যাকরণশুদ্ধ বা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষা বলিতেছ কিনা, তাহাতেই বা কি আসে যায়? তোমার ভাষা আলঙ্কারিক কিনা, তাহাতেই বা কি আসে যায়? প্রশ্ন এই—মানুষকে তোমার দিবার কিছু আছে কি? ইহা কেবল কথা শোনা নয়, ইহা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। প্রথম প্রশ্ন এই—তোমার কিছু দিবার আছে কি? যদি থাকে তবে দাও। শব্দগুলি তো শুধু ঐ দেওয়ার কাজ করে মাত্র, ইহারা শুধু কিছু দিবার বিবিধ উপায়গুলির অন্যতম। অনেক সময় কোন প্রকার কথাবার্তা না কহিয়াই এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রে আছেঃ

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

কি আশ্চর্য! দেখ ঐ বটবৃক্ষের মূলে বৃদ্ধ শিষ্যগণসহ যুবা গুরু বসিয়া রহিয়াছেন। মৌনই গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যান এবং তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কখনও কখনও এমনও হয় যে, তাঁহারা আদৌ বাক্য উচ্চারণই করেন না, তথাপি তাঁহারা অপরের মনে সত্য সঞ্চারিত করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিপ্রাপ্ত—তাঁহারা চাপরাস পাইয়াছেন, তাঁহারা দূত হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা অপরকে অনায়াসে হুকুম করিয়া থাকেন; তোমাদিগকে সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদের শাস্ত্রে যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ জোরের সহিত অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তাহা কি তোমাদের স্মরণ হইতেছে না?

তিনি বলিতেছেন—'অতএব তোমরা যাও—গিয়া জগতের সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, আমি তোমাদিগকে যে-সকল বিষয় আদেশ করিতেছি, তাহাদিগকে সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দাও।' তাঁহার সকল উক্তির ভিতরই তাঁহার নিজের যে জগৎকে শিক্ষা দিবার বিশেষ কিছু আছে, তাহার উপর প্রবল বিশ্বাস দেখা যায়। জগতের লোক যাঁহাদিগকে প্রফেট বা অবতার বলিয়া উপাসনা করে, সেই সকল মহাপুরুষদের মধ্যেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মহত্তম আচার্যগণ এই পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা অপর আর কাহার উপাসনা করিব? আমি মনে মনে ঈশ্বরের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কি এক মিথ্যা ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা করিয়া বসিয়াছি। এরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে তো পাপই হইবে। কিন্তু চক্ষু মেলিলে দেখিতে পাই এই মহাপুরুষগণের বাস্তব জীবন ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে-কোন ধারণা অপেক্ষা উচ্চতর। আমার মত লোক দয়ার ধারণা আর কতদূর করিবে? কোন লোক যদি আমার নিকট হইতে কোন বস্তু চুরি করে, আমি তো অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে জেলে দিবার জন্য প্রস্তুত হই। আমার আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা কতদূর হইবে? আমার নিজের যতটুকু গুণ আছে, তাহার চেয়ে অধিক গুণের ধারণা আমার হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজে দেহের বাহিরে লাফাইয়া পড়িতে পার? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজ মনের বাহিরে লাফাইয়া যাইতে পার? কেহই নাই। তোমার ভগবৎ-প্রেমের ধারণা আর কি করিবে? বাস্তব জীবনে তোমরা নিজেরা যেরূপ পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাক, তদপেক্ষা ভালবাসার উচ্চতর ধারণা কিরূপে করিবে? নিজেরা যাহা কখনও উপলব্ধি করি নাই, সে-সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমার সকল ধারণাই প্রতি পদে বিফল হইবে। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের জীবনরূপ প্রত্যক্ষ ব্যাপার আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কল্পনা করিয়া আমাদের ধারণা করিতে হয় না। তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিয়া আমরা প্রেম, দয়া, পবিত্রতা এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহা আমরা কখনই কল্পনা করিতেও পারিতাম না। অতএব আমরা এই সকল নরদেবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব, ইহাতে

বিস্ময়ের কি আছে? আর মানুষ ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারে? আমি এমন লোক দেখিতে চাই, যে মুখে নিরাকার-তত্ত্বের কথা যতই বলুক না কেন, কার্যতঃ পূর্বোক্তভাবে সাকার উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে সমর্থ। মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। নিরাকার ঈশ্বর, নির্গুণতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মুখে আলোচনা কর—বেশ কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল নরদেবই হইলেন সকল জাতির উপাস্য যথার্থ ঈশ্বর। এই সকল দেবমানবই চিরদিন জগতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন, আর যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, ততদিন তাঁহারা পূজিত হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয়, যথার্থ ঈশ্বর আছেন, যথার্থ ধর্মজীবন আছে; আমাদের আশা হয় আমরাও ঈশ্বরলাভ—ধর্মজীবনলাভ করিতে পারিব। কেবল অস্পষ্ট গূঢ় তত্ত্ব লইয়া কি ফল হয়?

তোমাদের নিকট আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার সার মর্ম এই যে, আমার জীবন উক্ত সকল অবতারকেই পূজা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল অবতার আসিবেন, তাঁহাদিগকেও পূজা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সন্তান যে কোন বেশে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হউক না, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন। যদি না পারেন আমি নিশ্চই বলিতে পারি, তিনি কখনই তাহার মাতা নহেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, কোন একটি বিশেষ অবতারেই যথার্থ সত্য ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেছ, অপরের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইতেছ না, তোমাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃ এই সিদ্ধান্তই মনে উদিত হয় যে, তোমরা কাহারও দেবত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পার নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ গলাধঃকরণ করিয়াছ মাত্র। যেমন লোকে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া সেই দলের যে মত, তাহাই নিজের মত বলিয়া প্রচার করে, তোমরাও তেমনি ধর্মসম্প্রদায়বিশেষে যোগদান করিয়া সেই সম্প্রদায়ের মতগুলি নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ইহা তো প্রকৃত ধর্ম নহে। জগতে এমন নির্বোধও অনেক আছে, যাহারা নিকটে উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট জল থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষগণের খনিত বলিয়া লবণাক্ত কূপের জল পান করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে এই শিখিয়াছি যে, লোকে যে-সকল শয়তানির জন্য ধর্মকে নিন্দা করে, ধর্ম সে দোষে মোটেই দোষী নয়। কোন ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই,

কোন ধর্মই ডাইনী অপবাদ দিয়া নারীকে পুড়াইয়া মারে নাই, কোন ধর্মই কখনও এই ধরনের অন্যায় কার্যের সমর্থন করে নাই। তবে মানুষকে এ-সকল কার্যে উত্তেজিত করিল কিসে? রাজনীতিই মানুষকে এই সকল অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করিয়াছে, ধর্ম নয়। আর যদি এরূপ রাজনীতি ধর্মের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে কাহার দোষ?

এইরূপ যখনই কোন ব্যক্তি উঠিয়া বলে, আমার ধর্মই সত্য ধর্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনই ঠিক নহে, সে ধর্মের গোড়ার কথা জানে না। ধর্ম কেবল কথার কথা বা মতামত নহে, অথবা অপরের সিদ্ধান্তে কেবল নিজের বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্মের অর্থ—প্রাণে প্রাণে সত্য-উপলব্ধি করা; ধর্মের অর্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করা, প্রাণে অনুভব করা, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্মস্বরূপ আর সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তাঁহার সকল অবতারের সহিত আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি তুমি বাস্তবিকই সেই পরমপিতা গৃহে প্রবেশ করিয়া থাক, তুমি অবশ্যই তাঁহার সন্তানগণকেও দেখিয়াছ, তবে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না কেন? যদি চিনিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই তুমি সেই পরমপিতার গৃহে প্রবেশ কর নাই। সন্তান যে-কোন বেশে মাতার সম্মুখে আসুক, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন; সন্তানের যতই ছদ্মবেশ থাকুক, মাতার নিকট সন্তান কখনও আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তোমরা সকল দেশের, সকল যুগের ধর্মপ্রাণ মহান্ নরনারীগণকে চিনিতে শেখ এবং লক্ষ্য করিও, বাস্তবিক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেখানেই প্রকৃত ধর্মের বিকাশ হইয়াছে, যেখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্পর্শ ঘটিয়াছে, ঈশ্বরের দর্শন হইয়াছে, আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছে, সেখানেই মনের ঔদার্য ও প্রসারবশতঃ মানুষ সর্বত্র ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এমন সময় ছিল, যখন মুসলমানগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্রঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতির বহির্ভূত, সে-সমস্তই ধ্বংস করিতে হইবে এবং যে-কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তথাপি

সেই যুগেও যে সকল মুসলমান দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা এরূপ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাঁহারা সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং চিত্তের উদারতা লাভ করিয়াছিলেন।

আজকাল ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনা যায়, পাশাপাশি আর একটি মতবাদ মনুষ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, উহার নাম ক্রমাবনতি বা পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তন (Atavism)। ধর্ম বিষয়েও দেখা যায়, আমরা অনেক সময় উদারতার ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার প্রাচীন সঙ্কীর্ণ মতের দিকে ফিরিয়া আসি। কিন্তু প্রাচীন একঘেয়ে ভাব আশ্রয় না করিয়া আমাদের নূতন কিছু চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে ভুল থাকে থাকুক। নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় থাকা অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। লক্ষ্যভেদের চেষ্টা তোমরা কেন করিবে না? বিফলতার মধ্য দিয়াই তো আমরা জ্ঞানের সোপান আরোহণ করিয়া থাকি। অনন্ত সময় পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এই দেওয়ালটিকে দেখ দেখি। ইহাকে কি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ? কিন্তু উহা যে দেওয়াল সেই দেওয়ালই রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। মানুষ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আবার সেই মানুষই দেবতা হইয়া থাকে। কিছু করা চাই—হউক উহা অন্যায়, কিছু না করা অপেক্ষা তো উহা ভাল। গরুতে কখনও মিথ্যা বলে না, কিন্তু চিরকাল সেই গরু রহিয়াছে। যাহাই হউক কিছু একটা কর। মাথা খাটাইয়া কিছু ভাবিতে শেখ; ভুল হউক, ঠিক হউক—ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা কর দেখি। আমার পূর্বপুরুষেরা এইভাবে চিন্তা করেন নাই বলিয়া কি আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি সমুদয় হারাইয়া ফেলিতে হইবে? তাহা অপেক্ষা তো মরাই ভাল! আর যদি ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা জীবন্ত ধারণা, একটা নিজের ভাব কিছু না থাকে, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? নাস্তিকদের বরং কিছু হইবার আশা আছে, কারণ যদিও তাহারা অন্য সকল মানুষ হইতে ভিন্নমতাবলম্বী, তথাপি তাহারা নিজে চিন্তা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি নিজে কখনও চিন্তা করে না, তাহারা এখনও ধর্মরাজ্যে পদার্পণ করে নাই। তাহারা তো শুধু মেরুদণ্ডহীন জেলী-মাছের (Jellyfish) মত কোনরূপে নামমাত্র জীবনধারণ করিতেছে। তাহারা কখনও চিন্তা করিবে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ধর্মের জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু যে

অবিশ্বাসী নাস্তিক, সে ধর্মের জন্য ব্যস্ত, সে উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অতএব ভাবিতে শেখ, প্রাণপণ ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হও। বিফলতায় কি আসে যায়? স্বরূপ চিন্তা করিতে গিয়া যদি কোন অদ্ভুত মত আশ্রয় করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? লোকে তোমায় কিম্ভূতকিমাকার বলিবে বলিয়া যদি তোমার ভয় হয়, তবে উক্ত মতামত নিজ মনের ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখ, অপরের নিকট উহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাই হউক একটা কিছু কর। ভগবানের দিকে প্রাণপণ অগ্রসর হও, অবশ্যই আলোক আসিবে। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন আমার মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয়, কালে আমি নিজের হাতের ব্যবহার ভুলিয়া যাইব। গড্ডলিকা-প্রবাহের মত একজন যেদিকে যাইতেছে, সকলে সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে তো আধ্যাত্মিক মৃত্যু। নিশ্চেষ্টতার ফল তো মৃত্যু। ক্রিয়াশীল হও। আর যেখানে ক্রিয়াশীলতা, সেখানে বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকিবে। বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তো জীবন এত উপভোগ্য, বিভিন্নতাই জগতে সব কিছুর সৌন্দর্য ও কলাকৌশল; বিভিন্নতাই জগতে সমুদয় বস্তুকে সুন্দর করিয়াছে। এই বৈচিত্রই জীবনের মূল, জীবনের চিহ্ন; সুতরাং আমরা উহাতে ভয় পাইব কেন?

এইবার আমরা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণকে (Prophet) কতকটা বুঝিবার পথে অগ্রসর হইতেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পূর্বোক্তভাবে ধর্ম আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের মত না হইয়া যেখানেই লোকে ধর্মতত্ত্ব লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, যেখানেই ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রেমের উদয় হইয়াছে, সেখানেই আত্মা ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে—জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও, একবারও—সেই পরম বস্তুর আভাসমাত্র পাইয়াছে, সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের বন্ধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মের ক্ষয় হয়; কারণ তিনি তখন সেই পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন, যিনি দূর হইতেও অতি দূরে এবং নিকট হইতেই অতি নিকটে।৭ ইহাই ধর্ম, ইহাই ধর্মের সার। আর বাদবাকী কেবল মতমতান্তর এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় পৌঁছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র। আমরা এখন ঝুড়িটা লইয়া টানাটানি করিতেছি মাত্র, ফল সব নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে।

যদি দুই ব্যক্তি ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, তাহাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞসা করঃ তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ, তোমরা কি অতীন্দ্রিয় বস্তু অনুভব করিয়াছ? একজন বলিতেছে, যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র অবতার; আচ্ছা, সে কি যীশুখ্রীষ্টকে দেখিয়াছে? সে অবশ্য বলিবে, 'আমি দেখি নাই।' 'আচ্ছা বাপু, তোমার পিতা কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?'–'না, মহাশয়।' 'তোমার পিতামহ কি দেখিয়াছেন?' –' না, মহাশয়।' 'তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?'–'না, মহাশয়।' 'তবে কি লইয়া বৃথা বিবাদ করিতেছ? ফলগুলি সব নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে, এখন ঝুড়ি লইয়া টানাটানি করিতেছ!' যাঁহাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, এমন নরনারীর এইরূপে বিবাদ করিতে লজ্জাবোধ করা উচিত।

এই মহাপুরুষ ও অবতারগণ সকলেই মহান্ ও সকলেই সত্য। কেন? কারণ, প্রত্যেকেই এক একটি মহান্ ভাব প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় অবতারগণের কথা ধর। তাঁহারাই প্রাচীনতম ধর্মসংস্থাপক। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা ধরা যাউক। তোমরা সকলেই গীতা পড়িয়াছ, সুতরাং তোমরা দেখিবে সমগ্র গ্রন্থের মূল কথা–অনাসক্তি। সর্বদা অনাসক্ত হও। হৃদয়ের ভালবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার?–তাঁহারই অধিকার, যাহার কখনও কোন পরিণাম নাই। কে তিনি?–ঈশ্বর। ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না; কারণ তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব। তুমি একজনকে হৃদয় দিতে পার, কিন্তু যদি সে মরিয়া যায়, তবে তোমার দুঃখ হইবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে ঐরূপে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু আগামীকালই সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি তোমার স্বামীকে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু কাল তিনি হয়তো তোমার সহিত বিবাদ করিয়া বসিবেন। তুমি স্ত্রীকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পার, কিন্তু সে হয়তো কাল বাদ পরশু মরিয়া যাইবে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালবাসার কখনও অভাব হয় না। আমরা যেখানেই থাকি এবং যাহাই করি না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে দয়াময়, তাঁহার হৃদয় সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে প্রেমপূর্ণ। তাঁহার কখনই কোনরূপ পরিণাম নাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তিনি কখনই রাগ করেন না। ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করিবেন কিরূপে?

তোমার শিশুসন্তান নানা প্রকার দুষ্টামি করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি কি তাহার উপর রাগ কর? আমরা ভবিষ্যতে কি হইব তাহা কি ঈশ্বর জানেন না? তিনি নিশ্চয় জানেন, শীঘ্র বা বিলম্বে আমরা সকলেই পূর্ণত্ব লাভ করিব। সুতরাং আমাদের শত দোষ থাকিলেও তিনি ধৈর্য ধরিয়া থাকেন, তাঁহার ধৈর্য অসীম। আমাদের তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আর জগতের যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে কেবল তাঁহার প্রকাশ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীকে অবশ্যই ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী বলিয়া নহে। উপনিষদ্ বলেন, স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহা স্বামী বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া, ভগবান্ আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।৮

বেদান্তদর্শন বলেনঃ দাম্পত্য প্রেমে যদিও পত্নী ভাবেন, তিনি স্বামীকেই ভালবাসিতেছেন, অথবা পুত্রবাৎসল্যে জননী মনে করেন, তিনি পুত্রকেই ভালবাসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ঐ পতির ভিতর বা পুত্রের ভিতর অবস্থান করিয়া পত্নীকে ও জননীকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, তিনি ব্যতীত আকর্ষণের অন্য কিছু নাই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্নী ইহা জানেন না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনিও ঠিক পথে চলিতেছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকেই ভালবাসিতেছেন। তবে অজ্ঞাতসারে কাজ অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয়, জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি হয়। আমাদের শাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন। যেখানে প্রেম—যেখানেই একবিন্দু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে ঈশ্বর রহিয়াছেন; কারণ ঈশ্বর রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। যেখানে তিনি নাই, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলি এই ভাবের। তিনি সমগ্র ভারতে সমগ্র হিন্দুজাতির ভিতর এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুরা কাজ করিবার সময়, এমন কি জল পান করিবার সময়ও বলে, যদি কার্যের কোন শুভ ফল থাকে, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম। বৌদ্ধগণ কোন সৎকর্ম করিবার সময় বলিয়া থাকে, এই সৎকর্মের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হউক, আর জগতের সমুদয় দুঃখকষ্ট আমাতে আসুক। হিন্দুরা বলে, আমরা

ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্, সকল আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং যদি আমরা সকল সৎকর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ, আর ঐ ফল নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ পাইবে।

ইহা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার একটি দিক্। তাঁহার অন্য শিক্ষা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কর্ম করেন, অথচ সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি কখনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিও তেমনি পাপে লিপ্ত হন না।

প্রবল কর্মশীলতা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক্। গীতা বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম কর। তোমরা বলিতে পার—তবে শান্তি কোথায়? যদি সারাজীবন ছেকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হয়, ঐরূপে গাড়ী জোতা অবস্থায় মরিতে হয়, তবে আমার জীবনে শান্তিলাভ হইল কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হ্যাঁ তুমি শান্তিলাভ করিবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্র হইতে পালায়ন শান্তির পথ নহে।' যদি পার সকল কর্তব্য কর্ম ছাড়িয়া পর্বতচূড়ায় বসিয়া থাক দেখি। সেখানে গিয়াও দেখিবে, মন সুস্থির নহে, ক্রমাগত এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। জনৈক ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কি একান্ত নিরুপদ্রব মনোরম স্থান পাইয়াছেন? আপনি হিমালয়ে কত বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?' সন্ন্যাসী উত্তরে বলিলেন, 'চল্লিশ বৎসর।' তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, হিমালয়ে তো অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে, আপনি উহাদের মধ্যে একটি নির্বাচন করিয়া অনায়াসে থাকিতে পারিতেন। আপনি তাহা করিলেন না কেন?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার মন আমাকে উহা করিতে দেয় নাই।' আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে যে, আমরা শান্তিতে থাকিব, কিন্তু আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

তোমরা সকলেই সেই 'তাতার-ধরা'৯ সৈনিক পুরুষের গল্প শুনিয়াছ। জনৈক সৈনিক পুরুষ নগরের বহির্দেশে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া সেনাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি একজন তাতারকে ধরে ফেলেছি।' ভিতর হইতে একজন বলিল, 'তাকে ভিতরে নিয়ে এস।' সৈনিক বলিলেন, 'সে আসছে না, মশায়।' 'তবে তুমি

একাই ভিতরে চলে এস।’—‘সে যেতে দিচ্ছে না, মশায়।’ আমাদের মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা সকলেই ‘তাতার ধরিয়াছি’। আমরাও উহাকে থামাইতে পারিতেছি না, উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না। আমরা সকলেই যে পূর্বোক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় ‘তাতার ধরিয়াছি’! আমরা সকলেই বলিয়া থাকি—শান্ত ভাব অবলম্বন কর, স্থির শান্ত হইয়া থাক, ইত্যাদি। এ কথা তো প্রত্যেক শিশুই বলিতে পারে, আর মনে করে, সে ইহা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা করা কঠিন। আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছি। আমি সব কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পর্বতশিখরে পলাইয়াছিলাম, গভীর অরণ্যে ও পর্বতগুহায় বাস করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই; কারণ আমিও ‘তাতার ধরিয়াছিলাম’, সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছিল। আমার মনের মধ্যে ঐ ‘তাতার’ রহিয়াছে, অতএব বাহিরে কাহারও উপর দোষ চাপানো ঠিক নহে। আমরা বলিয়া থাকি, বাইরের এই অবস্থাচক্র আমার অনুকূল; ঐ অবস্থাচক্র আমার প্রতিকূল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল গোলযোগের মূল ঐ ‘তাতার’ আমার ভিতরেই রহিয়াছে। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেনঃ ‘কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না, মানুষের মত উহাদের সাধনে অগ্রসর হও; উহাদের ফলাফল কি হইবে, তাহা ভাবিও না।’ ভৃত্যের প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, সৈনিক পুরুষের বিচার করিবার অধিকার নাই। কর্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইতে থাক, তোমাকে যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহা বড় কি ছোট, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিও না। কেবল মনকে জিজ্ঞাসা কর, মন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেছে কিনা। যদি তুমি নিঃস্বার্থ হও, তবে কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না, কিছুই তোমার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। কাজে ডুবিয়া যাও, হাতের সামনে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহাই করিয়া যাও। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমে ক্রমে সত্য উপলব্ধি করিবে; ‘যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করেন, আবার পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তভাবের ভিতর প্রবল কর্মশীলতা দেখেন, তিনিই যোগী, তিনিই মহাপুরুষ তিনিই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ হইয়াছেন।’ ১০

এক্ষণে তোমরা দেখিতেছ যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত উপদেশের ফলে জগতের সমুদয় কর্তব্যই পবিত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জগতের এমন কোন কর্তব্য নাই, যাহাকে 'ছোট কাজ' বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাধিরাজের রাজ্যশাসনরূপ কর্তব্যের সহিত সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্যের কোন প্রভেদ নাই।

এক্ষণে তোমরা বুদ্ধদেবের উপদেশ মনোযোগের সহিত শোন। তিনি জগতে যে মহতী বার্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাণীও আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে। বুদ্ধ বলিতেছেন, স্বার্থপরতা এবং যাহা কিছু তোমাকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে, তাহাই একেবারে উন্মূলিত কর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া (স্বার্থপর) সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হও। সংসারী লোক মনে করে, আমি নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু যখনই সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, অমনি সে স্বার্থপর হইয়া পড়ে। মা মনে করেন, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু শিশুর মুখের দিকে তাকাইলেই তাঁহার স্বার্থপরতা আসিয়া পড়ে। এই জগতের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইরূপ। যখনই হৃদয়ে স্বার্থপর বাসনার উদয় হয়, যখনই লোকে কোন স্বার্থপর কার্য করে, তখনই তাহার মনুষ্যত্ব—যাহা লইয়া সে মানুষ—তাহা চলিয়া যায়, সে তখন পশুতুল্য হইয়া যায়, দাসবৎ হইয়া যায়, সে নিজে প্রতিবেশিগণকে, তাহার ভ্রাতৃস্বরূপ মানবজাতিকে ভুলিয়া যায়। তখন সে আর বলে না, 'আগে তোমার হউক, পরে আমার হইবে', বরং বলে, 'আগে আমার হউক, তারপর বাকী সকলে নিজে নিজে দেখিয়া লইবে।' আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের জন্য আমাদের হৃদয়ের একদেশ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ না করিলে আমরা কখনই শান্ত ও অকপটভাবে এবং সানন্দে কোন কর্তব্য কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে কর্ম তোমাকে করিতে হইতেছে, তাহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তবুও ভয় পাইও না; কারণ, এমন কোন কাজই নাই, যাহাতে কিছু না কিছু দোষ নাই।১১ 'সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, আর উহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।'

অপরদিকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিতেছে। সেই বাণী বলিতেছেঃ সময় চলিয়া যায়, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও

দুঃখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীগণ, তোমরা পরম মনোহর হর্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম উপাদেয় চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ; এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে; তাহাদের কথা কি কখনও ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসত্য এইঃ সর্বং দুঃখমনিত্যমধ্রুবম্—দুঃখ আর দুঃখ—অনিত্য জগৎ দুঃখপূর্ণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন—ইহাই মহা সত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান। সুতরাং আমরা যদি ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ে স্থান দিই, আমাদের কখনও স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়।

আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেথবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার উপদেশঃ 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্তী।' আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ি। আমি হঠাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই—'সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন সততই দুঃখময়।' ঐ বাণী শুনিবামাত্র মন এই সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে—কাহার কথা শুনিব, শ্রীকৃষ্ণের কথা না শ্রীবুদ্ধের কথা? তখনই বজ্রবেগে ভগবান্ ঈশার বাণী আসিয়া উপস্থিত হয়, 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাক, উহা তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান্ ঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে, আমরা সাদরে তাঁহার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা এই ঈশদূতকে—সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি।

তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্য ভাবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারঃ 'মহম্মদের ধর্মে আবার ভাল কি থাকিতে পারে?' তাঁহার ধর্মে নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে—যদি না থাকিত,

তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে কিরূপে? যাহা ভাল, তাহাই স্থায়ী হয়, অন্য সমুদয়ের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। যাহা কিছু ভাল, তাহাই সবল ও দৃঢ়, সুতরাং তাহা স্থায়ী হয়। এই পৃথিবীতেই বা অপবিত্র ব্যক্তির জীবন কতদিন? পবিত্রচিত্ত সাধুর প্রভাব কি তাহা অপেক্ষা বেশী নয়? নিশ্চয়ই; কারণ পবিত্রতাই বল, সাধুতাই বল। সুতরাং মহম্মদের ধর্মে যদি কিছুই ভাল না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া আছে কিরূপে? মুসলমান-ধর্মে যথেষ্ট ভাল জিনিষ আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, জগতের প্রত্যেক অবতার, প্রত্যেক ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, প্রত্যেক ঈশদূতই জগতে বিশেষ বিশেষ সত্যের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। যদি তোমরা প্রথমে সেই বাণী শ্রবণ কর এবং পরে আচার্যের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সত্যের আলোকে তাঁহার সমগ্র জীবনটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। অজ্ঞ মূর্খেরা নানাবিধ মতমতান্তর কল্পনা করিয়া থাকে, আর নিজ নিজ মানসিক উন্নতি অনুযায়ী, নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া এই সকল মহাপুরুষে তাহা আরোপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের উপদেশসমূহ লইয়া তাহারা নিজেদের মতানুযায়ী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেক মহান্ আচার্যের জীবনই তাঁহার বাণীর একমাত্র ভাষ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, তিনি নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপদেশের সহিত ঠিক মিলিবে। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার বাণীর কি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের মুসলমান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর তাহার যদি উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের

প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনরী হঠাৎ কোন গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দেবে। আমাদের এত উচ্চ দর্শনশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময়, আচরণের সময় আমরা কিরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।

পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ ও অবতারের বিষয় কথিত হইল, তাঁহারা ছাড়া অন্য মহত্তর অবতার কি জগতে আসিবেন? অবশ্যই আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা আসিবেন বলিয়া বসিয়া থাকাও যায় না। আমি বরং চাই, তোমাদের প্রত্যেকেই সমুদয় প্রাচীন সংহিতার সমষ্টিস্বরূপ এই যথার্থ নব সংহিতার আচার্য হও, প্রবক্তা হও। প্রাচীনকালে বিভিন্ন আচার্যগণ যে-সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি গ্রহণ কর, নিজ নিজ অনুভূতির সহিত মিলাইয়া উহাদের সম্পূর্ণ কর এবং দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া অপরের নিকট ঐ সত্য ঘোষণা কর। পূর্ববর্তী সকল আচার্যই মহান্ ছিলেন, প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু সত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা তাহাদিগকে নমস্কার করি, আমরা তাঁহাদের দাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও নমস্কার করিব; কারণ তাঁহারা যেমন প্রফেট, ঈশ্বরতনয় বা অবতার, আমরাও তাহাই। তাঁহারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমরাও এখনই … ইহজীবনেই সিদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হইব। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—‘স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।’ এখনই, এই মুহূর্তেই, এস আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি—‘আমি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হইব, আমি সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের বার্তাবহ হইব, আমি ঈশ্বরতনয়—শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ হইব।’

৬. কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা

[এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খ্রীঃ ১ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে প্রদত্ত। আইডা আনসেল (Ida Ansell) নাম্নী জনৈক শ্রোত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৫৬ খ্রীঃ Vedanta and the West পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি ইহার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করেন। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই, সেখানে ... চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার অংশ স্বামীজীর ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কর্তৃক সন্নিবেশিত।]

যে কারণ পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, সে-যুগের অনুরূপ ঘটনাবলী আমরা এযুগেও ঘটিতে দেখি।

নির্দিষ্ট আদর্শ একটি আছে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে না, ধারণাতেও তাহা আনিতে পারে না। ... যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহারা ঐ আদর্শ অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অসমর্থদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি থাকে না। শক্তিমানের নিকট দুর্বল তো শুধু কৃপারই পাত্র! শক্তিমানরাই আগাইয়া যান। ... অবশ্য ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাদের সাহায্য করাই উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হৃদয়বান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান। এ পৃথিবীতে কয়েক বৎসরের জীবন দ্বারা এখনই সমগ্র অনন্ত জীবন নিরূপিত করিয়া ফেলিতে হইবে—এই মত যদি অনুসরণ করিতে হয়, ... তবে ইহা আমাদের নিকট অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই হইবে। ... যাহারা দুর্বল, তাহাদের কথা ভাবিবার অবসর আমাদের থাকিবে না।

যদি এই জগৎ আমাদের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষালয় হয়, যদি অনন্ত জীবন শাশ্বত নিয়ম অনুসারেই গঠিত, রূপায়িত এবং পরিচালিত করিতে হয়, আর শাশ্বত নিয়মে সুযোগ যদি প্রত্যেকেই লাভ করে, তাহা হইলে তো আমাদের তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলের সাহায্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার প্রচুর সময় আমাদের আছে।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সংস্কৃতে আমরা দুইটি শব্দ পাইঃ একটি—‘ধর্ম’ অপরটির ‘সঙ্ঘ’। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরগণের অবলম্বিত ধর্মের কোন নাম নাই, (যদিও) বিদেশীরা ইহাকে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। ‘ধর্ম’ এক, তবে ‘সম্প্রদায়’ অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক্ করিয়া ফেল, তখনই ইহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তখন আর উহা ‘ধর্ম’ থাকে না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে), ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে ‘ধর্ম’ বিশ্বাস করে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন দিক্ (উপস্থাপিত করিতেছে)। মানবজাতির লক্ষ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয়ই সর্ব প্রথম সকলের মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

এই কৃষ্ণ বুদ্ধের কয়েক হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী। এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, কৃষ্ণ কখনও ছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস—প্রাচীন সূর্যোপাসনা হইতে কৃষ্ণের পূজা উদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ নামে বহু ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, এক কৃষ্ণ ছিলেন রাজা, আর একজন ছিলেন সেনাপতি। সবগুলি এক কৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যাপার

এই যে, যখন আধ্যাত্মিকতায় অনুপম এমন একজন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি যে-সকল ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়, সেগুলিকে তাঁহার চরিত্রের (ছাঁচে) নূতন করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টের গল্পগুলি খ্রীষ্টের সর্বজনগ্রাহ্য জীবন (এবং) চরিত্রের আলোকেই রূপায়িত করা উচিত। বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই 'পরার্থে আত্মত্যাগ'রূপ তাঁহার সমগ্র জীবনের প্রধান সুরটি বজায় রাখা হইয়াছে।

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই ... তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাবঃ প্রথম—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপাদির অসারতা কৃষ্ণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন।

যদি তুমি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমার মত বলবান্ নয়, তাহাকে অভিশাপ দিও না। ... প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, 'হতভাগ্য তোমরা!' কে আর বলে, 'আহা, আমি কী হতভাগ্য যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না!' মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী যতদূর করিবার করিতেছে, কিন্তু কী দুঃখের কথা, আমি তো তাহাদিগকে আমার পর্যায়ে টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না!

তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন, আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা সবই ঠিক। ... কেন? কারণ এগুলি একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। ক্রিয়াকলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক—এ সবই এক শৃঙ্খলের এক-একটি শিকলি। শক্ত করিয়া ধর। ইহাই একমাত্র কর্তব্য। যদি তুমি অকপট হও, আর যদি দীর্ঘ শৃঙ্খলের একটি শিকলিও ধরিতে পারিয়া থাক, তবে ছাড়িয়া দিও না, বাকী অংশটুকু তোমার কাছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু মানুষ) ধরিতে চায় না। তাহারা কেবল

ঝগড়া-বিবাদে এবং কোন্‌টি ধরিব এই বিচারেই সময় কাটায়, ফলে কোন কিছুই ধরিয়া থাকে না। ... আমরা সর্বদা সত্যকে খুঁজিয়াই' বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে কখনও চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিয়া বেড়ান ও (চাওয়ার) মজা। আমাদের প্রচুর শক্তি এইভাবেই ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেনঃ মূল কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খলগুলির যে-কোন একটি ধরিয়া ফেল। কোন একটি সোপান অপরটি হইতে বড় নয়। ... যতক্ষণ আন্তরিকতা থাকে, ততক্ষণ কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না। যে-কোন একটি শিকলি জোর করিয়া ধর, তাহা হইলে ইহা তোমাকে কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া যাইবে। ... বাকী যাহা কিছু সব তোমার হৃদয়ই শিখাইয়া দিবে। ভিতরে গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন শিক্ষা দিবেন।

খ্রীষ্টের মত কৃষ্ণও নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'একদিনের জন্যও আমার পথের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। সকলকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। যে আমাকে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, আমি তাহাকে সে ভাবেই অর্থাৎ সেই ফলপ্রদানের দ্বারাই অনুগৃহীত করি এবং ঐ ভাবের মধ্য দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হই। ...' কৃষ্ণের হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

কৃষ্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্ভীক ব্যক্তিত্বে আমরা ভয় পাই। আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভর করি ... কয়েকটি মিষ্টি কথার উপর, অবস্থার উপর। যখন আত্মা কিছুরই উপর নির্ভর করেন না, এমন কি জীবনের উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। উপাসনার উপর কৃষ্ণ খুব জোর দিয়াছেন। (ঈশ্বরের উপাসনা কর।)

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে পাই। আর্ত ভগবানকে খুব ডাকে। ... যাহার ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সেও ধনলাভের আশায় খুব প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের জন্যই যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইতে পারেঃ) 'যদি ঈশ্বর আছেন, তবে এত দুঃখ কষ্ট কেন?' ভক্ত বলেন, ' ... জগতে দুঃখ আছে; (কিন্তু) তাই

বলিয়া আমি ভগবানকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য আমি তাঁহার উপাসনা করি না। তাঁহাকে আমি ভালবাসি, কেন না তিনি প্রেমস্বরূপ।' অন্য (প্রকারের) উপাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের; কিন্তু কৃষ্ণ কোন উপাসনারই নিন্দা করেন নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ক্রমে উন্নত হইবে এবং তাঁহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে।

এই জীবন-যাপন করিয়া কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিবে? আমাদের সকলকে কি অরণ্য গুহায় যাইতে হইবে? ... না, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। মন যদি বশীভূত না হয়, তবে গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ এই একই মন সেখানেও নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। আমরা গুহাতেও বিশটি শয়তান (দেখিতে পাইব), কেননা যত সব শয়তান তো মনেই। মন বশে থাকিলে আমরা যেখানে বাস করি না কেন, উহা গুহার সমান।

আমরা যে-জগৎ দেখিতেছি, আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই তাহা সৃষ্টি করে। আমাদেরই চিন্তাধারা বস্তুনিচয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে। সমস্ত সংসারটাই আমাদের মনের মধ্যে। ঠিক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শেখ। প্রথমতঃ এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমাদের চোখে কিছু মন্দ ঠেকে, তবে মনে করিও যে যথার্থভাবে তাহা বুঝিতেছ না। সব বোঝা নিজের উপর লও। ... যখনই আমরা বলিতে প্রলুব্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখনই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সংসারের সব কিছু ঠিকভাবে দেখিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি।

দিবারাত্র কাজ কর। 'দেখ, আমি জগতের ঈশ্বর, আমার কোন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল হইবে)।' অতএব কেবল কাজ করিয়া যাও, কিন্তু কর্তব্যবোধে নয়।

এই সংসার যেন একটি খেলা। তোমরা তাঁহার (ভগবানের) খেলার সাথী। কোন দুঃখ, কোন দুর্গতির কথা না ভাবিয়া কাজ করিয়া যাও। কদর্য বস্তিতে এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ভগবানেরই লীলা দেখ। লোককে উন্নত করিবার জন্য কাজ কর! (তাহারা যে পাপী বা হীন, তাহা নয়; কৃষ্ণ এরূপ বলেন না।)

সৎকাজ এত কম হয় কেন জান? কোন ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন। ... তিনি কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'আহা, গরীব বেচারীরা! ইহা লইয়া সুখী হও।' ... আবার কোন সুন্দরী হয়তো রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা তাহার সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভাব দেখি, ইহা কিরূপ নিন্দনীয়! আমরা ধন্য যে, এই বিষয়ে তোমাদের বাইবেলে ভগবান্ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যীশু বলিতেছেন, 'তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে দীনতম ব্যক্তির জন্য ইহা করিয়াছ বলিয়া ইহা আমারই জন্য করা হইয়াছে।' তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার, এইরূপ চিন্তা করাও অধর্ম। প্রথমতঃ সাহায্য করার ভাবটি মন হইতে উৎপাটিত কর, তারপর উপাসনা করিতে যাও। ঈশ্বরের সন্তানসন্ততি যে তোমার প্রভুরই সন্তান। (আর সন্তান তো পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।) তুমি তো তাঁহার সেবক। ... জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর! ঈশ্বর তোমার নিকট অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার জন্য উপাসনার কী চমৎকার সুযোগ! যে মুহূর্তে চিন্তা কর যে, তুমি 'সাহায্য' করিতেছ, তখনই সমস্ত আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া ফেলিয়াছ। এইটি জানিয়া কাজ কর। প্রশ্ন করিবে, 'তার পর?' তোমাকে আর হৃদয়ভেদী ভয়ানক দুঃখে পড়িতে হইবে না। ... তখন কর্ম আর বন্ধন হইবে না। কর্ম খেলা হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্য। যদি আসক্ত হও, দুঃখ আসিবে।

জীবনে আমরা যাহাই করিতে যাই, তাহার সঙ্গে নিজেদের এক করিয়া ফেলি। এই লোকটি কটু কথা বলিল, আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ক্রোধের সঙ্গে আমি এক হইয়া গেলাম—তারপরই আসে দুঃখ। নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই অসত্য। অনিত্য অসত্যের প্রতি

আসক্তিই দুঃখ আনে। একমাত্র সৎস্বরূপই সত্য; তিনিই একমাত্র জীবন, তাঁহাতে বিষয়-বিষয়ী (object and subject) বোধ নাই।

কিন্তু নিষ্কাম ভালবাসায় তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। বিবাহ করিতে পার, সন্তানের জনক হইতে পার … তোমার যাহা খুশী তাহা করিতে পার—কিছুই তোমাকে দুঃখ দিবে না; 'অহং'—বুদ্ধিতে কিছু করিও না। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর; কর্মের জন্যই কর্ম কর। তাহাতে তোমার কি? তুমি নির্লিপ্তভাবে পাশে দাঁড়াইয়া থাক।

যখন আমরা ঐরূপ অনাসক্তি লাভ করি, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তখনই বুঝিতে পারি—একই সঙ্গে কি তীব্র কর্মচাঞ্চল্য ও শান্তি! প্রতিক্ষণে কি কর্ম, আবার কি বিশ্রাম! ইহাই সংসারের রহস্য—একই সত্তায় অকর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব, একই আধারে অনন্ত এবং সান্ত। তখনই আমরা রহস্যটি আবিষ্কার করিব। 'যিনি তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি এবং অসীম শান্তির মধ্যে চরম কর্মচাঞ্চল্য লাভ করেন, তিনিই যোগী হইয়াছেন।' কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর কেহই নন। আমরা একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? যেহেতু আমরা কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলি। যদি আমরা আসক্ত না হই, তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারি।

এইরূপ অনাসক্তিতে পৌঁছান কত কঠিন! সেইজন্য কৃষ্ণ আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা নারী) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্তা হইতেছে ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন না হইয়া কর্ম করা। বাসনাই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা যদি কর্মের ফল চাই, তবে শুভই হউক, আর অশুভই হউক, উহার ফল ভোগ করিতে হইবেই। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করি, তাহা হইলে ফল নিজের ভাবনা নিজেই ভাবিবে। ' কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।' সৈনিক ফলের আশা না করিয়াই যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন

করিয়া যায়। যদি পরাজয় হয়, তাহা সেনাপতির—সৈনিকের নয়। প্রীতির জন্যই আমরা কর্তব্য করিব—সেনাপতির প্রীতির জন্য, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য।

যদি শক্তি থাকে, বেদান্তদর্শনের ভাব গ্রহণ কর এবং স্বাধীন হও। যদি তাহা না পার তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পার, কোন প্রতীকের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও যদি না পার, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সৎ কাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে, ভগবানের সেবায় উৎসর্গ কর। যুদ্ধ করিতে থাক। 'যে-কেহ ভক্তিভরে আমার উদ্দেশ্যে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।'১৬ যদি তুমি কিছুই করিতে না পার, একটি সৎ কাজও যদি তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে প্রভুর শরণ লও। 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের মত চালাইতেছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও ...। '

কৃষ্ণ (গীতায়) ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন, এগুলি তাহারই কয়েকটি। বুদ্ধ ও যীশুর ভক্তিবিষয়ক উপদেশ আরও অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থে আছে।

কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। যীশু এবং কৃষ্ণের জীবনের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোন্ চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার করা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল অনেকটা এক অবস্থায়। দুইজনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। দুইজনকেই দেবদূতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাবস্থাও একই প্রকার। ... আবার পরিণামে উভয়েই নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়; তিনি তাঁহার হত্যাকারীকে স্বর্গে লইয়া যান। খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়; তিনি দস্যুর মঙ্গল কামনা করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

নিউ টেষ্টামেন্ট এবং গীতার উপদেশগুলিতেও অনেক মিল আছে। মানুষের চিন্তাধারা একই পথে অগ্রসর হয়। ... কৃষ্ণের নিজের কথায় আমি তোমাদিগকে ইহার উত্তর দিতেছিঃ 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট, জানিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার পূজা করিবে। ...'

তিনিই যদি বুদ্ধ বা যীশুরূপে অবতীর্ণ হন, তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাঁহাদের উপদেশ অবশ্য পালনীয়। হিন্দু ভক্ত বলিবেনঃ স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য আচার্য (লোকগুরু)-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক বলিবেনঃ ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানবজাতির হিতসাধন করেন, আশৈশব জানেন—তাঁহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ...। আমাদের মত বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। ... নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আমরা ঐ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণাবর্ত অগণিত নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে, কেননা এই মহাপুরুষদেরই একজন না একজন পিছন হইতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাই যতদিন সমগ্র মানবজাতির মুক্তি না হয় এবং এই পৃথিবীর খেলা পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন ইহা চলিতে থাকে।

যাঁহাদের জীবন আমরা অনুধ্যান করিতেছি, সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্বিত হউক। তাঁহারাই তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারাই তো আমাদের উপাস্য। ভগবান্ যদি মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হন, কেবল তখনই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি? মানবদেহে সীমাবদ্ধ হইলেই আমাদের পক্ষে তাঁহাকে দেখা সম্ভব। ... যদি মানুষ ও ... জীবসকলকে ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানি, তবে এই আচার্যগণই মানবজাতির

নেতা এবং গুরু। অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মনুষ্যজাতির পথপ্রদর্শকগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মহান্ আচার্যগণ, তোমাদের প্রণাম! হে পৃথিকৃৎগণ, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের চির প্রণতি।

৭. ভগবান্ বুদ্ধ

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এক এক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতনধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি; যাহার এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান্ বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না; ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেক অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ও-সব আমি কিছু জানি না।' মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'নিজে ভাল কাজ কর এবং ভাল হও।' একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, 'ভগবান্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।' অপরে বলিলেন, 'না, না, ও-কথা ভুল; কারণ আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।' এইরূপ অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি এ কথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?'

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না, ভগবান্, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণময়।' ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন?'

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে? জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না।অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ-শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।' তিনি সর্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখ জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা-নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করিলে আপনার স্বর্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার

হইবে, অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।' রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরষ সর্ববিধ অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোন দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগের অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইহয়া থাকে।

বুদ্ধের বাণী

[১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত ভাষণ]

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম—দার্শনিক দৃষ্টিতে নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে

পড়েছিল। এমন কোন সভ্যতা নেই, যার উপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব অনুভূত হয়নি।

বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যমী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন; রুশ, পোল্যাণ্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সামরিক জয়যাত্রার ফলে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমধ্য-অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ভারতের মনীষাও তখন এশিয়া ও ইওরোপের বিশাল দেশগুলির মধ্যে বিস্তৃত পথ খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশে দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন, আর তাঁদের শিক্ষার ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলি বিদূরিত হতে লাগল।

এই আন্দোলনকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে ভারতে যে অবস্থা ছিল, তা জানা দরকার—যেমন খ্রীষ্টধর্মকে বুঝতে হলে খ্রীষ্টের সমকালীন য়াহুদী সমাজের অবস্থাটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, সেই ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেকবারই তার পতন ও অভ্যুদয় হয়েছে—এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বহু জাতিরই একবার উত্থানের পর পতন হয় চিরতরে। দু-রকম জাতি আছেঃ এক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান, আর এক আছে যাদের উন্নতির অবসান হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয়, কিন্তু আবার উত্থানও হয়; কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি একেবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না—তাদের হয় মৃত্যু। শান্তিকামীরাই ধন্য, কারণ শেষ পর্যন্ত তারাই পৃথিবী ভোগ করে।

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম, সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান্ ধর্মনেতার—আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকুল ইতোমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। য়াহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন—পুরোহিত ও ধর্মগুরু; পুরোহিতরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র। সমগ্র 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' (Old Testament) দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করেছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হল ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

পুরোহিতরা বিশ্বাস করত—ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে। পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে! পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজা করতে হবে এবং তাদেরই হাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এই পুরোহিত-প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে; এই মারাত্মক ক্ষমতালিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের আদিম বৃত্তি। পুরোহিতরাই সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সহস্র রকম বিধিনিষেধ জারী করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শোনাবে। যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাও তো তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যত রকম আচার-অনুষ্ঠান আছে, সব করতে হবে। এগুলি জীবনকে এতই জটিল এবং বুদ্ধিকে এতই ভ্রান্ত করে যে, আমি সোজাসুজিভাবে কোন কথা বললেও আপনারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন। ধর্মাচার্যেরা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের কুসংস্কার ও মতলব সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ এখনও সে-সব সতর্কবাণী শুনতে শেখেনি—এখনও তাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে।

মানুষকে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে। আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান, এ-কথা সে জানবে কি করে? এজন্য তার

থাকা চাই—সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাবমুক্ত পরিষ্কার মন; সমস্ত অসার সংস্কাররাশিকে ভেদ করে অন্তরের গভীরে যে শুদ্ধ সত্য আছে, তাতেই তার মনকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে জানবে যে, পূর্ণতা ও সমগ্র শক্তি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে—অপর কেউ এগুলি তাকে দিতে পারে না। যখনই সে এইটি বোধ করে, সেই মুহূর্তেই সে মুক্ত হয়ে যায়, সে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অনুভব করে, প্রত্যেকেই তারই মত পূর্ণ এবং অন্য ভাইয়ের উপর কোন রকম দৈহিক মানসিক বা নৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার তার আর কিছুই থাকে না। তার চেয়ে ছোট কেউ থাকতে পারে—এই ভাবটি সে একেবারে ত্যাগ করে। তখনই সে সাম্যের কথা বলতে পারে, তার পূর্বে নয়।

যাক, যা বলছিলাম, য়াহুদীদের মধ্যে পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের বিরোধ অবিরাম চলছিল, এবং সব রকম শক্তি ও বিদ্যাকে পুরোহিতরা একচেটিয়া অধিকারে রাখতে সচেষ্ট ছিল, যতদিন না তারা নিজেরাই সেই শক্তি ও বিদ্যা হারাতে আরম্ভ করেছিল। যে শৃঙ্খল তারা সাধারণ মানুষের পায়ে পরিয়ে দেয়, তা তাদের নিজেদেরই পায়ে পরতে হয়েছিল। প্রভুরাই শেষ পর্যন্ত দাস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের পরিণতিই হল ন্যাজারেথবাসী যীশুর বিজয়—এই জয়লাভই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস। খ্রীষ্ট অবশেষে রাশীকৃত শয়তানি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার করে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন, যাতে যে-কেউ সেই সত্য লাভ করতে চায়, স্বাধীনভাবেই সে তা পেতে পারে। এ জন্য কোন পুরোহিতের মর্জির অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না।

য়াহুদীরা কোনকালেই তেমন দার্শনিক জাতি নয়; ভারতীয়দের মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের ছিল না বা ভারতীয় মননশীলতাও তারা লাভ করেনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবর্তক তো তাঁরাই, আর সত্যই তাঁরা বিস্ময়কর সব কাজও করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সেই উদার মনোভাবটি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করলেন। কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে খুনও করতেন,

তবুও তাঁর কোন শাস্তি হত না। ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মগত অধিকারবলেই অধীশ্বর। এমন কি অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও সম্মান দেখাতে হবে।

কিন্তু পুরোহিতেরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন 'সন্ন্যাসী' নামে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন। প্রত্যেক হিন্দু, তা তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য সব কর্ম পরিত্যাগ করে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংসার যাঁদের কোনমতেই ভাল লাগে না, তাঁরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এরূপ দু-হাজার আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সন্ন্যাসীরা মোটেই মাথা ঘামান না; যথাঃ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কর—দশ অক্ষর, দ্বাদশ অক্ষর ইত্যাদি; এগুলি বাজে জিনিষ।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন। কিন্তু দুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন—ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে।' এইভাবে সত্য বস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণই বার বার এসেছেন। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি—দুই-ই সর্বদা থাকবে, নতুবা মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা অবাক হচ্ছ যে, পুরোহিতদের এত সব জটিল নিয়ম-কানুন কেন? তোমরা সোজাসুজি সত্যের কাছে আসতে পার না কেন? তোমরা কি সত্যকে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ, নতুবা এত সব দুর্বোধ্য আচার-বিচারের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কেন? জগতের সম্মুখে সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না বলে তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত নও? এই তো তোমাদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা? পুরোহিতরাই সত্য প্রচারের যোগ্য পুরুষ! সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে, কিছুটা তরল করতে হবে।

যীশুর শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) এবং গীতাই ধরা যাক—অতি সহজ সরল সে-সব কথা। একজন রাস্তার লোকও বুঝতে পারে। কী চমৎকার! সত্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবেই এখানে প্রকাশিত। কিন্তু না, ঐ পুরোহিতরা এত এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলাটা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। লোকে যদি তাদের বিধান মেনে চলে, তবে স্বর্গে গতি হবে; আর তাদের অনুশাসন না মানলে লোকে নরকে যাবে।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ-সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাদের অনিষ্টই হবে। এঁরা বলেন—নির্বিশেষ সত্য লোককে জানান উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপসের ভাবে চলেও জগতের এমন কিছু একটা মঙ্গল হয়নি। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? সত্যকেই ব্যক্ত কর। যদি তা যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে, তাহলে শয়তানির পক্ষই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এই-সব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটিমাত্র শব্দও কোন বেচারার কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হত। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল!

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মত অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয়—আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই; কি উপায়ে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার

মত যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ—তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি। সব কিছুর সমাধান করেছিলেন তিনি। তিনি নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।

তোমরা আর্নল্ড-এর 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) কাব্যে পড়েছঃ বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হলেও নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা তাঁকে মোটেই শান্তি দিতে পারেনি; পত্নী এবং নবজাত শিশুসন্তানকে রেখে কিভাবে তিনি সংসার ত্যাগ করেন; সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে কেমন করে বোধিলাভ করলেন। তাঁর বিশাল ধর্মান্দোলন, শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্মসঙ্ঘের কথাও তোমরা জান। এ-সবই জানা কথা।

ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয় রূপে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতদের সম্পর্কে একটি কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার—তাঁরা কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন না; ধর্মদ্রোহিতাও তাঁরা করেননি কখনও। যে-কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধে প্রচার করতে পারত। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এ-রকম ছিল যে, কোন ধর্মমতের জন্য তাঁরা কোনকালে কাউকে নির্যাতিত করেননি। কিন্তু পুরোহিতকুলের অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল; তাঁরাও ক্ষমতালোভী হলেন, নানা আইন-কানুন বিধি-বিধান তৈরী করে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তুলছিলেন, আর এইভাবেই তাঁদের ধর্মের যারা অনুগামী, তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

ধর্মের এইসব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে তিনি প্রচার করেছিলেন। নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন; বৃহত্তর জগৎকে তিনি এই শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের

আচার্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হতে পেরেছিল; নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত দেশেও তাঁর বাণী সত্যই খুব বলিষ্ঠ। যতপ্রকার ধর্মই প্রচার করা হোক, কোন ভারতীয়ই তাতে ব্যথিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ হজম করতে ভারতকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। আপনাদের কাছে তা আরও কত কঠিন লাগবে!

তাঁরা বাণী ছিল এইঃ আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদের জন্য সব কিছু বাসনা করি—তাই তো এত দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্মবিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন-মৃত্যুর গতাগতির মূলে ' আত্মা' বলে কিছুই নেই। আছে শুধু চিন্তাপ্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল, আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই—এইমাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের কর্তা কেউ নেই—কোন জ্ঞাতাও নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'—মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।

এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি; জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পশুবলি যদি কল্যাণের হয়, তবে তো মনুষ্যবলি অধিকতর কল্যাণের'—এবং নিজেকেই তিনি যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত একটি কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথামত যদি সত্যই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতন কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্য-কারণের

অতীত, তাহলে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এ-রকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, এবং আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্য—আমাদের দিকে করুণায় ফিরে তাকাবার মত এক মুহূর্ত অবসরও তাঁর নেই! সমগ্র জীবনটাই নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের; কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি নয়—মৃত্যুর পরেও আবার নানা স্থানে ঘুরতে হবে এবং আরও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তথাপি এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশী করবার জন্য আমরা কতই না যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড করে চলেছি!'

বুদ্ধ বলছেনঃ এ-সব আচার-অনুষ্ঠান—সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটিই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তাই শুধু থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যালোক ফুটে উঠবে। 'অহং'-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও; একটি সামান্য পিপীলিকার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাক। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করবে না, কোন ভগবানকে খুশী করবার জন্যও নয় বা কোন পুরস্কারের লোভেও নয়—কারণ শুধু 'অহং'কে বিনাশ করে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ! পূজা-উপাসনা এ-সব নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বল 'ভগবানকে ধন্যবাদ'—কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জান না, অথচ 'ভগবান্', 'ভগবান্' করে সবাই মেতে উঠেছ।

হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব-কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ঈশ্বরকে হিন্দুরা আঁকড়ে থাকবেই। তারা কখনই এ-দুটি পরিত্যাগ করতে পারে না। আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? 'অহং'-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা আমাদের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।

তথাপি এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালবাসা যা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল—শুধু মানুষের

সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখমোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুড়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত, সহস্র সহস্র জীবহত্যা করত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হল সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।

সত্য যেন সত্যেরই মত ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল এই আচার্যের ইচ্ছা। কোন রকম নতি বা আপসের বালাই নেই; কোন পুরোহিত, কোন ক্ষমতাপন্ন লোক, কোন রাজার তোষামোদ করবারও আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কারমূলক আচারের কাছে—তা যত প্রাচীনই হোক না কেন, কারও মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই; সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলেই কোন অনুষ্ঠান বা পুঁথিকে মেনে নিলে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন। এমন কি যে সংস্কৃত ভাষায় বরাবর ভারতবর্ষে ধর্ম শিক্ষা চলে আসছিল, তাও তিনি বর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা ঐ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কারগুলি কোনরূপ গ্রহণ করতে না পারে।

যে-তত্ত্বটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম, তাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা যায়—হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আমরা বলি, বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের কথা আছে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। মায়াতে আমরা আত্মাকে বহু দেখি। আত্মা কিন্তু এক, বহু নয়। সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেনঃ মানুষ

শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত করে আমি নিজেকেই আঘাত করি। আমিই বিশ্বজগৎ। আমি যে ভাবি, আমি অমুক—ইহাই মায়া। প্রকৃত স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হবে, এই মায়াও তত দূরে যাবে। বিভিন্নত্ব ভেদবুদ্ধি যতই লোপ পাবে, ততই বোধ করবে যে সবই এক পরমাত্মা। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু দূর আকাশে অবস্থান করছেন—এমন একজন কেউ নন তিনি। তিনি শুদ্ধ আত্মা। কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান? তোমার মনের অন্তরের অন্তস্তলেই তিনি রয়েছেন; তিনিই হচ্ছেন অন্তরাত্মা। তোমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করে কিভাবে ধারণ করবে? যখন তুমি তাঁকে তোমা থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবছ, তখন তাঁকে জানতে পার না; 'তুমিই তিনি'—এটিই ভারতীয় ঋষিদের বাণী।

তুমি অমুককে দেখছ—এবং জগতের সব তোমা থেকে পৃথক্, এ-রকম ভাব নিছক স্বার্থপরতা। তুমি মনে কর, তুমি আর আমি ভিন্ন। আমার কথা তুমি একটুও ভাব না। তুমি ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে। আমি মরে গেলেও তোমার ভোজন পান ও আনন্দ ঠিকই থাকে। কিন্তু সংসারের বাকী লোক যখন কষ্ট পায়, তখন তুমি সুখ ভোগ করতে পার না। আমরা সকলেই এক। বৈষম্য ভ্রমই যত দুঃখের মূল। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই—কিছুই নেই।

বুদ্ধের শিক্ষা হল—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রচলিত যাবতীয় মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছান্ন করে! সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তাহলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে, বল? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরই কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান্ তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য ধারণা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল ও পেশীগুলোকে দুর্বল করে দেয়, আর আমাদের পরনির্ভশীল করে তোলে। যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি; যখনই পরাধীনতা, তখনই দুঃখ। মানুষের নিজের মধ্যে অনন্ত শক্তি, এবং সে তা বোধ করতে পারে—সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ও অনন্ত আত্মা। নিশ্চয়ই তা সম্ভব, কিন্তু

তোমরা তো বিশ্বাস কর না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছ, আবার সর্বদা নিজেদের বারুদও তাজা রাখছ।

বুদ্ধের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। মানুষকে আর কাঁদতে দিও না। পূজা-প্রার্থনার কোন দরকার নেই। ভগবান্ তো আর দোকান খুলে বসেননি? প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা; আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের ভজনা করছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাক, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তাহলে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল নয়, তাতে কখনও কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কি কোন যাদুমন্ত্র, কোন রকম পরিশ্রম না করে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল লাভ করবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে; অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র সবারই ভিতরে সেই এক অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বার বার বলে ফল লাভ করবে– এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগৎও একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই; নীরব পূজা বরং ভাল।

এই মতবাদের যথার্থ মর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভারতবর্ষে আত্মা সম্বন্ধে কোন-রকম আপসের অর্থ পুরোহিতমণ্ডলীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া, এবং আচার্যদের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া। বুদ্ধ এ-কথা জানতেন; তাই তিনি পুরোহিত-অনুশাসিত সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। জনসাধারণের অভ্যস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁকে আনতে হয়েছিল। ফলে এই যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্ম ভারত থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, কোনকালেই তার পুনরভ্যুদয় হল না।

বৌদ্ধধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটি বিপদের বীজ ছিল—বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকেই বেশী জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না—সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা—যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। নাস্তি-ভাবের প্রকোপে সত্যের অস্তি-ভাবমূলক দিকটা চাপা পড়ে যায় এবং এই কারণেই বুদ্ধের নামে যে সব বিনাশমূলক মনোভাব আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার অনুশাসনই এই।

ঈশ্বর বলে কেউ নেই এবং আত্মাও নেই—বৌদ্ধধর্মের এই সব নাস্তি-ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি বলি—একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; এটাই সন্দেহাতীত দৃঢ় উক্তি। তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। বুদ্ধ যেমন বলেন, আত্মা বলে কিছু নেই, আমিও বলি, 'মানুষ তুমি বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হয়ে আছ; তুমিই সব।' কত বাস্তব! সংস্কারের উপাদান মরে গেছে, কিন্তু সংগঠনী বীজ চিরকালের জন্য সজীব আছে। বুদ্ধ নিম্নজাতীয় প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, তার পর থেকে ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যারা সর্বজীবে, এমন কি পশুপক্ষীদের প্রতিও করুণা করতে শেখায়নি। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হল বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ-জীবনের একটা বিশেষ অবদান আছে। আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক।

আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মত অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণ চিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?

তারপর তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কথা ভেবে দেখ। কোনরকম ভাবাবেগ নেই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুসংস্কারের লেশও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে, অথবা বন্ধুরা বিশ্বাস করতে বলছে—এই সব কারণেই বিশ্বাস কর না; তুমি নিজেই বিচার করে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর; নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের বা বহুর পক্ষে কল্যাণপদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমলমস্তিষ্ক ক্ষীণমতি দুর্বলচিত্ত কাপুরুষেরা কখনও সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মত উদার ও মুক্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল স্বচ্ছ, তবেই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। কী কুসংস্কাররাশিতে পরিপূর্ণ আমরা সবাই! তোমাদের দেশেও, যেখানে তোমরা নিজেদের খুবই শিক্ষিত বলে ভাব, কী সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তোমরা! ভেবে দেখ তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ-শ বছর আগে, বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, ভারতবাসীরা অবশ্যই আশ্চর্য রকম শিক্ষিত ছিল; নিশ্চই তারা অত্যন্ত উদার ছিল। বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল, নৃপতিরা সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, রাণীরা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। এত বিপ্লবাত্মক এবং যুগ যুগ ধরে প্রচারিত পুরোহিতদের শিক্ষার চেয়ে এত ভিন্ন তাঁর শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে জনসাধারণ সহজেই সমাদর ও গ্রহণ করতে পেরেছিল। অবশ্য তাদের মনও ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এইবার তাঁর পরিনির্বাণের কথা চিন্তা কর। তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও ছিল তেমনি মহৎ। তোমাদের আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নির্বিচারে সব কিছু খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বল, আমার জীবনে এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে—সে আমাকে দেহ-মুক্ত করে দিয়েছে।' এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসে কাছে বসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'এ কী? আমরা এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার ওপর কিছুমাত্র নির্ভর কর না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনিকিংবা উপলব্ধির স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।'

এমন কি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবী করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হচ্ছেন উপলব্ধির এক একটি অবস্থার নামমাত্র। লোকশিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী করে শিক্ষা দিয়েছেন, শুধু মিথ্যা 'অহং'—এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা—যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন, তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে-অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে; সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

৮. ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

[১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা]

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল এবং একটি শূন্য গহ্বর সৃষ্ট হইল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয়তো উহা পূর্বেপেক্ষা বৃহত্তর; উহারও পতন হইল, আবার একটি উঠিল। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনা প্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান- পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ উত্থানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, পতনের দিকে নয়। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই স্বার্থকতা আছে, কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বজগতের ইহাই প্রকৃতি। কি চিন্তাজগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্বত্র এই ক্রমিক গতি, সর্বত্রই উত্থান-পতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রধান ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ—সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য কিছুকালের মত ইহা অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার বল সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল ইহা কোথায় ডুবিয়া যায়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ উত্থান-পতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশদূতের জীবনচরিত আমরা আজ অপরাহ্নে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চয়ই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে অল্পমাত্র আভাস পাই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে তাহা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিত। আর তাঁহার তিনবর্ষব্যাপী ধর্ম প্রচারের মধ্যে

যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সংঘটিত হইয়াছে, সেগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিতে এই উনিশ শত বৎসর লাগিয়াছে। কে জানে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আরও কতদিন লাগিবে? আপনারা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার। কয়েক মুহূর্তে, কয়েক ঘণ্টা, বড়জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তি-বিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আর কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর এই পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন, এখনও তাহার প্রচার কার্যের বিরাম নাই, এখনও তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই তাহাও নব বলে বলীয়ান হইতেছে।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনে আপনারা যাহা দেখিতে পান, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন—সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাবসমূহের ফলস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ আসিয়া থাকে বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার হইতে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। বর্তমানের আমরা সেই অনন্ত অতীতে কৃত কার্যের ফল ব্যতীত আর কি? অনন্ত ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান, অনিবার্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও স্থির থাকিতে অসমর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আমরা আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। কিন্তু জাগতিক ঘটনা প্রবাহরূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকিবেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান্ পুরুষ আছেন, যাঁহারা প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের দিকেও তাঁদের হস্ত প্রসারিত। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের নির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইঁহারা এত বড় যে, ইঁহাদের ছায়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনশ্বর থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, ‘ঈশ্বর-তনয়ের ভিতর দিয়া দেখা ব্যতীত অন্য উপায়ে

কেহ কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই'—এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বর-তনয়ের মধ্য দিয়া না দেখিলে ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে আমাতে—আমাদের মধ্যে অতি দীনহীন ব্যক্তিতে পর্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্বব্যাপী, সর্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও ইহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ জগতের বিরাট আলোকস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল দেবমানবে, ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ; এইসকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে সমগ্র জগতে সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানলোকের এই মহান্ বার্তাবহগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর এই আদর্শ হইতে নিম্নে পড়িয়া আছে এবং অবতারের—ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা না হইতে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আদর্শের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এইসকল মহাপুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ধারণা করিতে আপনারা কখনই সমর্থ হইবেন না। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এইসকল মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায়? এই দেবমানবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে এ পৃথিবীতে একমাত্র দেবতারূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সর্ববিধ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই তাহা নহে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনা কেবল এইভাবেই সম্ভব।

আপনারা যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন, বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতে মানবদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই মানবভাবাপন্ন,

আপনাদের ধর্মও মানবভাবে ভাবিত এবং আপনাদের ঈশ্বরও মানবভাবাপন্ন হইবেন। অবশ্যই এরূপ হইবে। এমন লোক কে আছে, যে সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিবে না, এবং যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ, তাহাকে ত্যাগ করিবে না? সেইজন্য এই ঈশ্বরাবতারগণ সকল যুগে সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এখন য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থানের পূর্বে তরঙ্গের যে পতনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীগণ সেই অবস্থায় ছিল। ইহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়। এ অবস্থায় মানুষের মন যেন সম্মুখে চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং এতদিন ধরিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যত্নবান্ হয়। এ অবস্থায় জীবনের সার্বভৌম ও মহান্ সমস্যাসমূহের দিকে নিবিষ্ট না হইয়া মন খুঁটিনাটির দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় তরণী যেন অগ্রসর না হইয়া নিশ্চল থাকে, ইহাতে নিজস্ব চেষ্টা অপেক্ষা অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহ্য করিবার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এ অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, ইহার সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র অধিকার আমাদের নাই। কারণ যদি পতন না হইত, তবে ন্যাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্তী উত্থান মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইত না। ফারিসি ও সাদিউসিগণ২১ হয়তো কপট ছিলেন; হয়তো তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না; হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুক না কেন, ঈশদূত যীশুর আবির্ভাবরূপ কার্য বা ফলের বীজ বা কারণ তাঁহারাই। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী ন্যাজারেথবাসী যীশুরূপে আবির্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্মের অত খুঁটিনাটির উপর অনুরাগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্মজীবনের শক্তি নিহিত। অনেক সময়

আমরা অত্যধিক অগ্রসর হইতে গিয়া ধর্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটা মহৎ গুণ আছে, তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। জাতির ভিতরেও ঐরূপ শক্তি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। চতুর্দিকে বাহ্যশত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত, রোমক-শাসনে তাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ, চিন্তা-জগতে গ্রীক প্রবণতা দ্বারা এবং পারস্য ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাবতরঙ্গরাজি দ্বারা এক নির্দিষ্ট গণ্ডীতে কেন্দ্রীভূত হইয়া চতুর্দিকে দৈহিক মানসিক নৈতিক সর্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই য়াহুদীজাতি এক সহজাত রক্ষণশীল প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান ছিল; ইহাদের বংশধরগণ আজও সে শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজালেম ও য়াহুদীধর্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর যেমন—সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারে না, চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া নিজেকে নিঃশেষিত করে, য়াহুদীদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাতে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবে বলিয়া ইহাকে দীর্ঘকাল এক স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না।

য়াহুদী জাতির ভিতরে এই কেন্দ্রীভূত শক্তি পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া একটি স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে এক উদ্বেল তরঙ্গসঙ্কুল নদী উৎপন্ন হইল। তাহার শীর্ষদেশে ন্যাজারেথবাসী যীশু সমাসীন। এইরূপে প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁহার সমসাময়িক অবস্থার ও তাঁহার নিজ জাতির অতীতের ফলস্বরূপ; তিনি আবার স্বয়ং ভবিষ্যতের স্রষ্টা। অতীত কারণসমষ্টির ফলস্বরূপ কার্যাবলী আবার ভাবী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই তাঁদের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের জন্য মহাশক্তির

আধারস্বরূপ; শুধু তাঁহার নিজ জাতির জন্য নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির জন্যও তাঁহার জীবন মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ ন্যাজারেথবাসী মহাপুরুষদের বর্ণনা আমি প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ হইতেই করিব। আপনারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তিনি একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। আপনারা তাঁহাকে নীল নয়ন ও পীত কেশ দ্বারা চিত্রিত করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি একজন খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে-সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণণা আছে, তাহার কবিত্ব, তাহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং তাহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি—এ-সকল প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তাহাতে উজ্জ্বল আকাশ, প্রখর সূর্য, তৃষ্ণার্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা, মেষপাল কৃষককুল ও কৃষিকার্যের বর্ণনা, পনচাক্কি ঘটীযন্ত্র তৎসংলগ্ন জলাধার ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা প্রভৃতি—এ সকলই এখনও এশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার বাণী চিরদিনই ধর্মের বাণী, আর ইওরোপের বাণী রাজনীতির। নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইওরোপের বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল। তদতিরিক্ত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্বর, তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে বাস করিবার অধিকার নাই, গ্রীকরা যাহা করে তাহাই ঠিক; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে, সুতরাং সেগুলি জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। গ্রীক মনের সহানুভূতি একান্তই মানবিক, অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত; এই জগতের বাহিরে কোন বিষয় সে স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, তাহার কবিতা পর্যন্ত এই ব্যাবহারিক জগৎকে লইয়া। তাহার দেবদেবীগণের কার্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা মানুষ, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট; সাধারণ মানুষ যেমন সুখে-দুঃখে হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তাঁহারাও প্রায় সেইরূপ। গ্রীক সৌন্দর্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, তাহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুতেই নহে, যথা—শৈলমালা, হিমানী ও কুসুমরাজির সৌন্দর্য, বাহ্য অবয়ব ও আকৃতির সৌন্দর্য, নরনারীর মুখের, বিশেষতঃ আকৃতির সৌন্দর্যেই গ্রীক মন আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণ পরবর্তী যুগের ইওরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইওরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এশিয়ায় আবার অন্য প্রকৃতির লোকের বাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন, কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্রভেদী হইয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ্ব করিতেছে, কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপ্ত বিশাল মরুভূমি—যেখানে একবিন্দু জলও পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটি তৃণও যেন উৎপন্ন হয় না, কোথাও নিবিড় অরণ্য ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে, যেন শেষ হইবার নাম নাই! আবার কোথাও বা বিপুলকায় স্রোতস্বতী প্রবল বেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান। চতুর্দিকে প্রকৃতির এইসকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতি অনুরাগ সম্পূর্ণ এক বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান, সেখানেও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান; গ্রীকেরা যেমন অপর জাতিগুলিকে বর্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, সেখানেও সেই ভেদবুদ্ধি সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু সেখানে জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এশিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ, বা ভাষা লইয়া জাতি গঠিত হয় না; সেখানে একধর্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সকল খ্রীষ্টান মিলিয়া এক জাতি, সকল মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সকল বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সকল হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউন না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্মাবলম্বী, সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেখানে ধর্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধন, মিলনভূমি। আর ঐ পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ কল্পনাপ্রবণ, তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের কলধ্বনি, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য চন্দ্র তারা—এমন কি সমগ্র জগতের সৌন্দর্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য,

তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্য মনের পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত নহে, সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। প্রাচ্যবাসী বর্তমানের—ইহজগতের গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে চায়। বর্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নহে। প্রাচ্যদেশ যুগযুগান্ত ধরিয়া যেন সমগ্র মানবজাতির শৈশবের শিশু-শয্যা; সেখানে ভাগ্যচক্রের সর্ববিধ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্যের, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অন্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য বৈভব গৌরব শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে; বিদ্যা ঐশ্বর্য বৈভব ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি—ইহাই যেন প্রাচ্যের পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সকল পদার্থকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতই এমন কোন বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী অবিনাশী এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখনও ক্লান্তিবোধ করেন না। আর আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, জগতের অবতার ও মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য কোন দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই শুনিতে পাইঃ এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে। আর ঐ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্যদেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আপনারা পাশ্চাত্যেরা নিজেদের কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ পরিচালনায় এবং সেইরূপ অন্যান্য কর্মে দক্ষ। হয়তো প্রাচ্যদেশীয়গণ ও-সকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে সফল, তাঁহারা ধর্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্যে পরিণত করিয়াছেন। যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচশত লোক পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত। আপনারা ইহাকে হাস্যাস্পদ বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন—ইহার পশ্চাতে তাহাদের দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান; তাহারা যে ধর্মকে কেবল

বিচারের বস্তু না ভাবিয়া জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তির যে-সকল বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেগুলি বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামমাত্র, তাহাদিগকে কোনকালে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ এই ন্যাজারেথবাসী যীশু যথার্থই প্রাচ্য ভাবে ভাবিত ছিলেন। এই নশ্বর জগৎ ও ইহার ঐশ্বর্যে তাঁহার আদৌ আস্থা ছিল না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্য বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এত প্রবলভাবে মোচড়ান হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না; শাস্ত্রবাক্যগুলি তো আর রবার নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর তাহারও একটা সীমা আছে। ধর্মকে বর্তমান যুগের ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার সহায়ক করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটি ভাল করিয়া বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কখনও খাটো না করি, কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্যজাতিগণ খ্রীষ্ট-জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, সেগুলি শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। তিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, কিছুই বোঝা যায় না। কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি, কেহ তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, কেহ বা তাঁহাকে অনুরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল-গ্রন্থে কি এমন কোন কথা লেখা আছে, যাহাতে ঐরূপ অনুমানগুলির কোন প্রমাণ আছে? একজন মহান্ ধর্মাচার্যের জীবনই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনুনঃ 'শৃগালেরও একটা গর্ত থাকে, আকাশচারী পাখীদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।' যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া দীনভাবে স্বীকার

করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগ বৈরাগ্যের শক্তি নাই, আমাদের এখনও 'আমি ও আমার' প্রতি ঘোর আসক্তি বর্তমান। আমারা ধন ঐশ্বর্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন না করি। তাঁহার কোন পারিবারিক বন্ধন ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন দেহভাব ছিল? আপনারা কি মনে করেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধার এই অতিমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুগণের সহধর্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা খুশী প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ—এই ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি নিজেকে আত্মা বলিয়াই জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মা, কেবল মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকু সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। পাশব ভাবের সহিত বিদেহ আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখনও বহুদূরে থাকিতে পারি, থাকিলামই বা, কিন্তু আদর্শটিকে আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পৌঁছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নর-নারী, সে য়াহুদীই হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনি-দরিদ্র, সাধু-অসাধু—সকলেই তাঁহার মত সেই এক অবিনশী আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানব জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ যথার্থ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তোমরা এই দীন হীন কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে, যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে

পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোনমতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।' আপনারা সকলেই ঈশ্বর-তনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেনঃ জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই অবস্থিত। আমি ও আমার পিতা অভেদ। ন্যাজারেথবাসী যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা ইহজীবনের বিষয় কখনও কিছু বলেন নাই। এই জগতের ব্যাপারে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না, শুধু মানবজাতি যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থা হইতে তাহাকে তিনি সম্মুখে খানিকটা আগাইয়া দিবেন, আর ক্রমাগত ইহাকে চালাইতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেক নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে-সকল পরস্পরবিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলী এবং 'উচ্চতর সমালোচনা'২২ নামক সাহিত্যরাশির সহিত আমরা পরিচিত। আর নানা গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট-অংশ কতটা সত্য, অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে—এ সকল বিষয় বিচার করিবার জন্য আজ আমরা এখানে উপস্থিত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্ট লিখিত হইয়াছিল কিনা, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা অংশ সত্য, এ সকল প্রশ্নেও কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ জীবনের পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যাহা অবশ্য সত্য—এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা বলিতে হইলে সত্যেরই নকল করিতে হয় এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিক সত্তা আছে। যাহা কোনকালে ছিল না, তাহার নকল করা চলে না। যাহা কেহ কোনকালেই উপলব্ধি করে নাই, তাহা কখনই অনুকরণ করা যায় না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল, নিশ্চয়ই সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির

আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই আজ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, তখন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের মত আমাকে এই ন্যাজারেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, অর্থাৎ আমায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোনরূপে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের ঐরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান স্তরে টানিয়া আনিয়া একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের শাস্ত্র বলেন, 'যাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই জ্যোতির তনয়গণ উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।'

কারণ, আপনারা এটি লক্ষ্য করিবেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূরে—ঊর্ধ্বে স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সিংহাসনে সমাসীন। লোকে তাঁহাকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'রূপে দর্শন করে। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এরূপ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা বা ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তো বলিতে পারেন, মানুষ নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ভ্রম বা মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, এ-কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এখান হইতে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন, সেখানে গিয়া সূর্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহৎ দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে

সূর্যের বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল, ইহাদের প্রত্যেকটি যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলিই যে সেই এক সূর্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ববিধ ধর্মপ্রণালীই সেই অনন্ত জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান মাত্র। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্মে উচ্চতর—এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতে গভীর চিন্তায় অসমর্থ জনসাধারণের ধর্মে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে অবস্থানকারী জগৎ-শাসক, পুণ্যবানের পুরস্কারদাতা ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এরূপ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। মানব অধ্যাত্মরাজ্যে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, যে-ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিদ্যমান; তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তাহার হৃদয়-মধ্যেই রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতই সকল আত্মার অন্তরাত্মা। আমার আত্মা যেমন আমার দেহকে পরিচালনা করিতেছে, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক ও নিয়ন্তা; আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মা। আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর শুদ্ধচিত্ত ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইলেন যে, তাঁহারা পূর্বোক্ত ধারণা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকে লাভ করিলেন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে, 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন।' অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা ও পিতা ঈশ্বর অভিন্ন।

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে এই মহান্ ধর্মাচার্য যীশু উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সাধারণ প্রার্থনা (Common Prayer) শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করুনঃ 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক' ইত্যাদি। ইহা সরল ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা 'সাধারণ প্রার্থনা'; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য—যাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তিনি উন্নততর সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেনঃ 'আমি আমার পিতাতে,

তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগের মধ্যেই বর্তমান। স্মরণ হইতেছে তো? আর যখন য়াহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনি কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' য়াহুদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজেকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের অমর্যাদা করিতেছেন। কিন্তু তিনি এই বাক্য কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই দেবতা বা ঈশ্বর—তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।' অতএব দেখুন, বাইবেলেও ধর্মের এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপানে পৌঁছানই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ঈশ্বরের দূত বার্তাবহ যীশু সত্যলাভের পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না, নানাবিধ কূট জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে বরং আরও ভাল; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি পুস্তকও না পড়িয়া থাকেন, সে আরও ভাল কথা। এগুলি আপনার মুক্তির জন্য একেবারেই আবশ্যক নয়; মুক্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য বৈভব উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন নাই; কেবল একটি জিনিষের প্রয়োজন পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। 'পবিত্রাত্মা যা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য', কারণ আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? আত্মা ঈশ্বরপ্রসূত, ঈশ্বর হইতে তাহার আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায় আত্মা 'ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ''; কোরানের ভাষায় তাহা 'ঈশ্বরেরও আত্মাস্বরূপ'। আপনারা কি বলিতে চান—এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারেন? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্মের দ্বারা তাহা যেন শত শত শতাব্দীর ধূলি ও মলিনতায় আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্যায় কর্ম, অশুভ কর্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতায় সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কেবল ওই ধূলি ও মলিনতা দূর করা আবশ্যক, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা নিজের প্রভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইবে। 'শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।' 'স্বর্গরাজ্য

তোমাদের অন্তরে।’ ন্যাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘যখন স্বর্গরাজ্য এখানেই–তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অন্বেষণের জন্য কোথায় যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেল, স্বর্গরাজ্য এখানেই বর্তমান, দেখিতে পাইবে। ইহা পূর্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? ইহা তো তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।’

ইহাই সেই সুসমাচার-বাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা। তাঁহার অপর শিক্ষা–ত্যাগ; ত্যাগই সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে কি করিয়া বিশুদ্ধ করিবে? ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘প্রভো, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?’ যীশু তাহাকে বলিলেন, ‘তোমার এখনও একটি জিনিষের অভাব আছে। যাও, বাড়ী যাও; তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর, তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ্ সঞ্চয় করিবে। তারপর নিজের দুঃখভার (Cross) বহন করিয়া আমায় অনুসরণ কর।’ ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মত। দিবারাত্র আমাদের কর্ণে সেই মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়-ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরাম আসিল, সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিলঃ ‘তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।’ ‘যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষার দিকে মনোযোগ দিবে, সে তাহা হারাইবে; আর যে আমার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিবে, সে তাহা পাইবে।’ কারণ, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ববিধ দুর্বলতার মধ্যে, সর্ববিধ কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কখনও কখনও যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষণা করিতে থাকেঃ ‘তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।’ তিনি ঐ

এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—তাহা এই ত্যাগ। এই ত্যাগের তাৎপর্য কি? সু-নীতির ডান গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে। যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে বহিরাবরণটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে ছোট না করিয়া যতদূর পারা যায় উত্তমরূপে কার্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এইঃ যে অবস্থায় মানুষের ‘অহং’ভাব কিছুই থাকে না, যখন কোন বস্তুতে তাহার কোন অধিকারবোধ থাকে না, যখন ‘আমি, আমার’ বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করে, সে নিজেকে যেন মারিয়া ফেলে—এরূপ ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ, তাহার ভিতর হইতে ‘অহং’বোধ একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদিগকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও আমাদিগকে ইতস্ততঃ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়। কল্যই হউক, আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পৌঁছিতেই হইবে। কারণ, ইহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, ইহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা—সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ ‘অহং’ভাব-ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ-ভাব মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতির সকল ধর্মাচার্যই সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। মনে করুন, ন্যাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন, কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, ‘আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর; আমি বিশ্বাস করি, ইহাই পূর্ণতা লাভের উপায়, আর আমি ইহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না।’ ন্যাজারেথবাসী যীশু এ-কথায় কি উত্তর দিবেন? তিনি নিশ্চয় উত্তর দিবেন, ‘বেশ ভাই, তুমি আদর্শ অনুসরণ কর এবং নিজের ভাবে ইহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের জন্য আমাকে প্রশংসা কর আর নাই কর, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি তো দোকানদার নই, ধর্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি

না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার অধিকার কাহারও নই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বর। আগাইয়া চল।’ কিন্তু তাঁহার অনুগামীরা আজকাল কি বলেন? তাঁহারা বলেন, ‘তোমরা তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর বা নাই কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি? যদি উপদেষ্টার—আচার্যের সম্মান কর, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।’ এইরূপে এই আচার্যবরের সমুদয় উপদেশই বিকৃত হইয়াছে। এখন কেবল উপদেষ্টার ব্যক্তিত্ব লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশ অনুসরণ না করিয়া উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে ব্যক্তিকে সম্মান না করিয়া একভাবে তাঁহাকে অপমানিতই করিতেছে। ঐরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া শুধু তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি বা তাঁহাকে মনে রাখিল বা না রাখিল, তাহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? জগতের নিকট তাঁহার একটি বার্তা ছিল, এবং তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য তাহা উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘৃণিত সামারিয়াবাসীর জন্য লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, এবং তাঁহার জীবনবলিই যদি প্রত্যেকের মুক্তির একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার নিজ জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইতেন। এ সমস্ত কাজই তিনি করিতেন, ইহাতে এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। স্বয়ং ভগবান্ যেভাবে কার্য করেন, তিনিও তেমনি ধীরস্থিরভাবে, নীরবে অজ্ঞাতভাবে কার্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুগামীরা এক্ষণে কি বলেন? তাঁহারা বলেন, ‘তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্দোষ হইতে পার, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তবে তাহাতে কোন ফল হইবে না।’ কেন? এই কুসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের অনুগামিগণ মনে করেন, ভগবান্ কেবল একবার মাত্র দেহে আবির্ভূত হইতে পারেন।

ঈশ্বর তোমাদের নিকট মানবরূপেই আবির্ভূত হন। সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চই অতীতে বহুবার ঘটিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই ঘটিবে।

প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন নহে; আর নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতে মহান্ অবতারগণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার 'ভগবদগীতা'রূপ অপূর্ব বাণী আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন; তিনি বলিতেছেনঃ

যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয় এবং প্রাণিজগতের ঈশ্বর, তথাপি নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

যখনই জগতের অবনতি হয়, তহনই ভগবান্ ইহার উন্নতির জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গীতায় আর একস্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেনঃ যখনই দেখিবে কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, জানিও তিনি আমারই তেজসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছি।

অতএব আসুন, আমরা শুধু ন্যাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবানকে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার পরে যাঁহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সকলের ভিতরই ঈশ্বর দর্শন করি। আমাদের উপাসনা যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্বল মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের সকলের, এমন কি ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সমস্ত পাপ নিজেরা গ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে আপনারা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্কন্ধে জগতের ভার বহন করিতেছেন। আপনারা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শান্তভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবনভার বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের স্কন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও সেই একই কর্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু বহন করিতে হয়। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্মের পরিণাম যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোন স্থানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোন স্থানে এমন এক স্বর্ণসূত্র আছে, যাহা দ্বারা আমরা সর্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ নিশ্চয়ই জানিবেন, যে মুহূর্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে, সেই মুহূর্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে না, সেহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলের কোন না কোন নিভৃত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোর্তিময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার সহিত ভগবানের নিত্যযোগ।

বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন মতাবলম্বী যে-সকল অবতারের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্ন জাতীয় যে-সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম; জীবন্ত-ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের বংশধরগণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।

৯. ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার

The Divine Incarnation or Avatara

[খ্রীষ্ট-বিষয়ক বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ]

যীশুখ্রীষ্ট ভগবান্ ছিলেন—মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর। বহু রূপে বহু বার ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমরা শুধু তাঁর সেই রূপগুলিরই উপাসনা করিতে পার। পরমব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের নির্গুণ ভাবকে উপাসনা করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ যীশুখ্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর বলে পূজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর কোন কিছুর পূজা কেউ করতে পারে না। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক্ কোন ভগবানের উপাসনা যত শীঘ্র ত্যাগ করিবে ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনানির্মিত যিহোবার কথা ধর, আবার সুন্দর মহান্ খ্রীষ্টের কথা ভেবে দেখ। যখনই খ্রীষ্টের ঊর্ধ্বে কোন ভগবান্ সৃষ্টি কর, তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করিতে পারে, মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের ঊর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস মানুষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি কেউ মুক্তি চাও তো খ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও; তোমাদের কল্পিত যে কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। যদি মনে কর খ্রীষ্ট একজন মানুষ ছিলেন তবে তাঁর উপাসনা কর না। কিন্তু যখনই ধারণা করতে পারবে—তিনি ঈশ্বর, তখনই তাঁর উপাসনা কর। যারা বলে—তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে পূজাও করে, তারা নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, অধর্মের কাজই করে। এখানে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে', আর পুত্রকে না দেখে কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু বড় বড় কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পনা! যদি আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে ধরে থাক।

দার্শনিক দিক্ দিয়ে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ বলে কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম। কোরানে মহম্মদ বার বার বলেছেন, খ্রীষ্ট কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি—ও একটা রূপকমাত্র; খ্রীষ্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না।

যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্ন স্তর দ্বৈতভাব, আর একের মধ্যে তিনের অবস্থিতিই উচ্চতম। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুস্যূত; ঈশ্বর, জগৎ এবং জীব—এই 'একের মধ্যে তিন'-কেই আমরা দেখেছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই দেহটি যেমন জীবাত্মার আবরণ, তেমনি এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার আবরণ বা দেহ। 'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মধ্যে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তারই মধ্যে তুমি রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একইকালে এগুলি আবার পৃথকও বটে।

আবার আর এক প্রকার 'ত্রিত্ব' (তিনে এক) আছে, অনেকটা খ্রীষ্টানদের 'ট্রিনিটি'-র মত। ঈশ্বরই পরমব্রহ্ম, এই নির্বিশেষ সত্তায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না; শুধু নেতি নেতি বলতে পারি মাত্র। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যসূচক কয়েকটি গুণ কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ আনন্দ—অনেকটা যেন তোমাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার অনুরূপ। পিতা হচ্ছেন সৎস্বরূপ, যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বরূপ, খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। খ্রীষ্টের পূর্বে ঈশ্বর সর্বত্র ছিলেন, সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরেছি, ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মার আবেশ। পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহূর্তে তুমি খ্রীষ্টকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ; আর তাতেই হবে তিনের একত্ব-সাধন।

১০. মহম্মদ

[সান ফ্রান্সিস্কোর বে-অঞ্চলে ১৯০০ খ্রীঃ ২৫ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ]

কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ—এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। এই তিন জনের প্রত্যকেই এক একটি মত প্রবর্তন করিয়া তাহা চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবুও আমরা বলিতে পারি, কৃষ্ণের পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার বাণী প্রাচীনতম। বৌদ্ধধর্মের প্রগতি-তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িক ভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আজ সায়াহ্নে আরবের মহাপুরুষ মহম্মদের বিশেষ কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মহম্মদ যৌবনে ধর্মবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন বলিয়া মনে হয় না; অর্থোপার্জনেই তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি সৎস্বভাব ও অতিশয় প্রিয়দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এক ধনী বিধবা এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর যখন মহম্মদ আধিপত্য লাভ করেন, তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিলেন। পত্নীদিগের মধ্যে কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি প্রথমা পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ‘তিনিই আমাকে প্রথম বিশ্বাস করেন। মেয়েদের মন বিশ্বাসপ্রবণ। ... স্বাধীনতা লাভ কর, সব কিছু লাভ কর, কিন্তু নারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি যেন হারাইও না!’

পাপাচরণ, পৌত্তলিকতা, উপাসনার নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, নরবলি প্রভৃতি দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় ব্যথিত হইল। খ্রীষ্টানদের দ্বারা য়াহুদীরা অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা মহম্মদের স্বদেশীয়গণ অপেক্ষা আরও অধঃপতিত হইয়াছিল।

আমরা সর্বদা তাড়াহুড়া করি। কিন্তু মহৎ কাজ করিতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। ... দিবারাত্র প্রার্থনার পর মহম্মদ স্বপ্নে অনেক কিছু দর্শন করিতে থাকেন। জিব্রাইল (Gabriel) স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া মহম্মদকে বলেন যে, তিনি সত্যের বার্তাবহ। দেবদূত তাঁহাকে আরও বলেন—যীশু, মুশা ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের বাণী লুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি মহম্মদকে ধর্ম প্রচারের আদেশ করেন। খ্রীষ্টানেরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসীকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করিতেছিলেন দেখিয়া মহম্মদ বলিলেন, 'আমাদের ঈশ্বর এক, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাহারও তুলনা হয় না।'

'ঈশ্বর ঈশ্বরই; এখানে কোন দার্শনিক বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নাই। আমাদের আল্লা এক অদ্বিতীয়, এবং মহম্মদই তাঁহার রসুল'—মক্কার রাস্তায় রাস্তায় মহম্মদ ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন। ... মক্কার লোকেরা তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে, তখন তিনি মদিনা শহরে পলাইয়া গেলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সমগ্র আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হইল। আল্লার নামে মহম্মদের ধর্মজগৎ প্লাবিত করিল। কী প্রচণ্ড বিজয়ী শক্তি!

আপনাদের ভাবসমূহ খুব কঠোর, আর আপনারা খুবই কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশবর্তী! এই বার্তাবহগণ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসেন, নতুবা তাঁহারা কিভাবে এত মহান্ হইতে পারিয়াছিলেন? আপনারা প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আপনাদের প্রত্যেকেরই দোষ-ত্রুটি আছে। কাহার না আছে? য়াহুদীদের অনেক দোষ আমি দেখাইয়া দিতে পারি। দুর্জনেরা সর্বদাই দোষ-ত্রুটি খোঁজে। ... মাছি ক্ষত অন্বেষণ করে, আর মধুমক্ষিকা শুধু ফুলের মধুর জন্য আসে। মক্ষিকা-বৃত্তি অনুসরণ করিবেন না, মধুমক্ষিকার পথ ধরুন।

পরবর্তী জীবনে মহম্মদ অনেক পত্নী গ্রহণ করেন। মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে দুই শত পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। আপনাদের মত 'দৈত্য'কে এক পত্নী গ্রহণ করিতেও আমি অনুমতি দিব না। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত। তাঁহাদের কার্যধারা দুর্জ্ঞেয়। তাঁহাদিগকে বিচার করিতে যাওয়া আমাদের অনুচিত। খ্রীষ্ট বিচার করিতে পারেন মহম্মদকে। আপনি আমি কে?—শিশুমাত্র। এইসকল মহাপুরুষকে আমরা কি বুঝিব?

মহম্মদের ধর্ম আবির্ভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে। ... তাঁহার প্রথম বাণী ছিল–'সাম্য'। ... একমাত্র ধর্ম আছে–তাহা প্রেম। জাতি বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও! সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল। ... সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরলঃ স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। শূন্য হইতে তিনি কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

মসজিদগুলি প্রোটেষ্টাণ্ট গীর্জার মত, ... সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতিকৃতি এখানে নিষিদ্ধ। এককোণে একটি বেদী; তাহার উপর কোরান রক্ষিত হয়। সব লোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কোন পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নাই। ... যে নমাজ পড়ে, সেও শ্রোতৃমণ্ডলীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। এই ব্যবস্থার কতকাংশ সুন্দর।

এই প্রাচীন মহাপুরুষেরা সকলেই ছিলেন ঈশ্বরের দূত। আমি নতজানু হইয়া তাঁহাদের পূজা করি, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু তাঁহারা মৃত! ... আর আমরা জীবিত। আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে! ... যীশু অথবা মহম্মদের অনুকরণ করাই ধর্ম নহে। অনুকরণ ভাল হইলেও তাহা কখনও খাঁটি নহে। যীশুর অনুকরণকারী হইবেন না, কিন্তু যীশু হউন। আপনারা যীশু বুদ্ধ অথবা অন্য কোন মহাপুরুষের মতই মহান্। আমরা যদি তাঁহার মত না হই, তবে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে সেরূপ হইতে হইবে। আমি ঠিক ঠিক যীশুর মত নাও হইতে পারি। য়াহুদী হইয়া জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনও আমার নাই।

নিজ নিজ প্রকৃতির নিকট খাঁটি হওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। যদি আপনাদের নিজের অস্তিত্ব না থাকে, তবে ঈশ্বর অথবা অন্য কাহারও অস্তিত্বই বা কিরূপে থাকিবে? যেখানেই থাকুন, এই মনই অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে পর্যন্ত অনুভব করে। ঈশ্বরকে আমি অনুভব করি, তাই তিনি আছেন। আমি যদি ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে না পারি, তবে আমার কাছে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। ইহাই মানব-প্রকৃতির বিরাট জয়যাত্রা।

এই মহাপুরুষগণ পথনির্দেশক চিহ্ন। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র পরিচয়। তাঁহারা বলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আগাইয়া যাও।' আর আমরা তাঁহাদিগকে আঁকড়াইয়া থাকি; নড়িতে চাহি না;

আমরা চিন্তা করিতে চাহি না, আমরা চাই অন্যে আমাদের জন্য চিন্তা করুক। ঈশদূতগণ তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপন করেন। পূর্ণোদ্যমে কর্মপথে চলিবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দেন। শত বৎসর পরে তাঁহাদের বাণী আমরা আঁকড়াইয়া ধরি এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই।

ধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদ সম্বন্ধে কথা বলা সহজ, কিন্তু চরিত্রগঠন ও ইন্দ্রিয়সংযম খুব কঠিন। এ বিষয়ে আমরা পরাভূত হই, কপট হইয়া পড়ি।

ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়মও নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া। মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্যই আবশ্যক। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই। মতবাদ ব্যায়ামবিশেষ—ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন উপকারিতা নাই। ... অনুশীলনের দ্বারা আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। যখন আপনি বলিতে পারেন, 'আমি বিশ্বাস করি'—তখনই সেই অনুশীলনের পরিসমাপ্তি।

' যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মনুষ্য-দেহ ধারণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'২৫

জ্ঞানালোকের মহান্ বার্তাবহগণের ইহাই পরিচয়। তাঁহারা আমাদের মহান্ আচার্য, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; কিন্তু আমাদিগকে নিজ নিজ পথে চালিত হইবে।

১১. পাওহারী বাবা

[মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ‘ব্রহ্মবাদিন’ পত্রিকার জন্য লিখিত—১৮৯৯]

১

ভগবান্ বুদ্ধ ধর্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকে সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া ‘তাপিত জগৎকে সাহায্য করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম’—এই ভাবটিকেই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাকেও অনেক বৎসর ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও বুদ্ধদেব অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মীর ধারণা করিতে অক্ষম; তথাপি সমুদয় বিষয়ের রহস্য বুঝিতে তাঁর অপেক্ষা আর কাহাকে কঠোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল? এ-কথা সকল সময়েই সত্য যে, কার্য যে পরিমাণে মহৎ, তাহার পশ্চাতে সেই পরিমাণে উপলব্ধির শক্তি নিহিত। পূর্ব হইতেই প্রস্তুত একটি সুচিন্তিত কার্য-প্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তি গভীর মনঃসংযোগেরই পরিণাম মাত্র। সামান্য প্রচেষ্টার জন্য হয়তো মতবাদমাত্র পর্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, প্রবল উর্মির জনক তীব্র বেগ হইতে তাহা নিশ্চয় খুবই পৃথক্। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটি প্রবল উর্মি-উৎপাদনকারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশমাত্র।

মন নিম্নতর কর্মভূমিতে প্রবল কর্মতরঙ্গ তুলিতে সক্ষম হইবার পূর্বে তাহাকে তথ্যসমূহের—নগ্ন সত্যসমূহের নিকট পৌঁছিতে হইবে, সেগুলি যতই কঠোর ও ভীষণ হউক; সত্যকে—খাঁটি সত্যকে (যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ছিন্ন হইতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট প্রেরণা (যদিও উহা লাভ করিতে একটির পর আর একটি করিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) অর্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণা করিবার জন্য

উহার চতুর্দিকে স্থূলবস্তুসমূহ একত্র করিতে থাকে; অদৃশ্য—দৃশ্যের আকার ধারণ করে; সম্ভব—বাস্তবে, কারণ—কার্যে এবং চিন্তা—প্রত্যক্ষ কর্মে পরিণত হয়।

সহস্র সহস্র ঘটনা যে কারণকে এখন কার্যে রূপায়িত হইতে দিতেছে না, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে কার্যরূপে প্রকাশিত হইবে; বর্তমানে যতই নিস্তেজ হউক না কেন, জড়জগতে শক্তিশালী চিন্তার গৌরবের দিন আসিবে। আর যে আদর্শ ইন্দ্রিয়সুখ-প্রদানের সামর্থ্যে দ্বারাই সকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে, তাহা যথার্থ আদর্শ নহে।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সে ইন্দ্রিয়ে তত অধিক সুখ অনুভব করে, সে তত অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে। ইন্দ্রিয়-সুখের পরিবর্তে উচ্চতর স্তরের দৃশ্য দেখাইয়া ও সেখানকার সুখ আস্বাদ করাইয়া পশুভাবাপন্ন মানুষকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার শক্তিকেই যথার্থ সভ্যতা বলিয়া বুঝা উচিত।

মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইহা জানে। সকল অবস্থায় সে নিজে ইহা স্পষ্টরূপে না-ও বুঝিতে পারে। ভাবময় জীবন সম্বন্ধে তাহার হয়তো ভিন্ন মত থাকিতে পারে, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহার প্রাণের এই স্বাভাবিক ভাব লুপ্ত হয় না, উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে—তাই সে বাজিকর, চিকিৎসক, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত অথবা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ যে-পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া উচ্চ ভূমিতে বাস করিবার শক্তি লাভ করে, তাহার ফুসফুস যে-পরিমাণ বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতে পারে এবং যতটা সময় সে এই উচ্চাবস্থায় থাকিতে পারে, তাহা দ্বারাই তাহার উন্নতির পরিমাপ হয়।

সংসারে ইহা দেখা যায় এবং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উন্নত মানবগণ জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু ব্যতীত তথাকথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক; আর যতই তাঁহারা উন্নত হইতে থাকেন, ততই নিতান্ত আবশ্যক কাজগুলিতে তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া যায়।

ভাব ও আদর্শ অনুসারে মানুষের বিলাসের ধারণা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে থাকে। মানুষ চেষ্টা করে, সে যে-চিন্তাজগতে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিলাসের বস্তুগুলিও যেন যথাসম্ভব তদনুযায়ী হয়—আর ইহাই কলা বা কৌশল।

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষাও ইহা অনেক বেশী'২৬—ঠিক কথা, অনন্তগুণে অধিক। এক কণা—সেই অনন্ত জ্ঞানের এক কণা-মাত্র আমাদের সুখবিধানের জন্য জড়-জগতে অবতরণ করিতে পারে, ইহার অবশিষ্ট ভাগকে জড়ের ভিতর টানিয়া আনিয়া এইভাবে স্থূল কঠিন হস্তে নাড়াচড়া করা যাইতে পারে না। সেই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সর্বদাই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইতেছে এবং ইহাকে আমাদের স্তরে আনিবার চেষ্টা দেখিয়া উপহাস করিতেছে। এক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে—'না' বলিবার উপায় নাই। মানুষ যদি সেই উচ্চস্তরের সৌন্দর্যরাশি ভোগ করিতে চায়, যদি সে ইহার বিমল আলোকে অবগাহন করিতে চায়, যদি সে দেখিতে চায় যে, তাহার নিজের জীবন সেই জগৎকারণের সহিত এক ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে, তবে তাহাকে সেই স্তরে উঠিতে হইবে।

জ্ঞানই বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, জ্ঞানই পশুকে দেবতা করে; যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট লইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে আর সকলই জানা হয়২৭, যাহা সকল জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ, যাহার স্পন্দনে সকল বিজ্ঞান জীবন্ত হইয়া উঠে—সেই ধর্মবিজ্ঞান নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, কারণ উহাই কেবল মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্যানময় জীবনযাপনে সমর্থ করে। ধন্য সেই দেশ যে দেশ ইহাকে 'পরাবিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছে!

কর্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখা যায় না, তথাপি আদর্শটি এখনও নষ্ট হয় নাই। একদিকে আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা আমাদের আদর্শের দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপেই অগ্রসর হই বা অতি ধীরে ধীরে অননুভবনীয় গতিতে অগ্রসর হই, আমরা যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যাই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, যদিও আমরা আমাদের চোখে হাত দিয়া সত্যের জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি সে আদর্শ সর্বদাই আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আদর্শই কর্মজীবনের প্রাণ। আমরা দার্শনিক বিচারই করি বা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্তব্য সম্পন্ন করি, আদর্শই আমাদের সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আদর্শের রশ্মি সরল বা বক্র নানা রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরাবর্তিত (refracted) হইয়া আমাদের জীবনগৃহের প্রতিটি গবাক্ষপথে আসিতেছে, আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার আলোক আমাদিগকে প্রত্যেক কার্যই করিতে হয়, প্রত্যেক বস্তুকেই ইহা দ্বারা পরিবর্তিত সুন্দর বা বিকৃতরূপে দেখা যায়। আমরা বর্তমানে যাহা হইয়াছি, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিয়াছে; আর ভবিষ্যতে যাহা হইব, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিবে। আদর্শের শক্তি আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; আমাদের সুখে দুঃখে, বড় বা ছোট কাজে, আমাদের ধর্মাধর্মে ইহার শক্তির পরিচয় অনুভূত হইয়া থাকে।

যদি কর্মজীবনের উপর আদর্শের এইরূপ প্রভাব হয়, কর্মজীবনও আদর্শ গঠনে কম শক্তিমান্ নহে। আদর্শের সত্য কর্মজীবনেই প্রমাণিত। আদর্শের পরিণতি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকিলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোন স্থানে, কোন না কোনরূপে ইহা কর্মজীবনেও পরিণত হইয়াছে। আদর্শ বৃহত্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত ভাবমাত্র। আদর্শ অনেক স্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্ঠি ও সাধারণ ভাবমাত্র।

কর্মজীবনেই আদর্শের শক্তিপ্রকাশ। কর্মজীবনের মধ্য দিয়াই ইহা আমাদের উপর কার্য করিতে পারে। কর্মজীবনের মাধ্যমে আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্তিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে অবতরণ করে। কর্মজীবনকে সোপান করিয়াই আমরা আদর্শে আরোহণ করি। উহারই উপর আমাদের আশা-ভরসা নির্ভর করে; উহা আমাদিগকে কার্যে উৎসাহ দেয়।

যাহাদের বাক্যবিন্যাস আদর্শকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—এরূপ একজন মানুষ অধিক শক্তিশালী।

ধর্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে, এবং অল্পবিস্তর সফলতার সহিত কর্মজীবনে ধর্ম পরিণত করিতে যত্নবান্ একদল অনুবর্তী না পাইলে মানবজাতির নিকট দর্শনশাস্ত্রসমূহ নিরর্থক প্রতীয়মান হয়, বড়জোর উহা কেবল মানসিক ব্যায়ামমাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-সকল মতবাদ একটা কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু পাইবার আশা জাগ্রত করে না, কতক লোক সেই সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াও কিছুটা কার্যে পরিণত করিতে পারে, এগুলিও স্থায়িত্বের জন্য বহু লোক প্রয়োজন, কারণ তাহার অভাবে অনেক নিশ্চিত মতবাদও লোপ পাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবময় জীবনের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। কোন কোন মহাত্মা পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, গভীরভাবে চিন্তা করিলে কার্যশক্তি হারাইয়া ফেলে, আবার বেশী কাজ করিলে গভীর চিন্তাশক্তি হারাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক মহামনস্বী যে-সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করেন, সেইগুলিকে জগতে কার্যে পরিণত করিবার ভার তাঁহাদিগকে কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে হয়। যতদিন না অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক আসিয়া আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিয়া প্রচার করিতেছে, ততদিন তাঁহাদের চিন্তারাশিকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা লিখিবার সময়েই আমরা দিব্যচক্ষে সেই পার্থসারথীকে দেখিতেছি, তিনি যেন উভয় বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যে রথে দাঁড়াইয়া বামহস্তে দৃপ্ত অশ্বগণকে সংযত করিতেছেন—বর্মপরিহিত যোদ্ধৃবেশে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা সমবেত সৈন্যদলকে দর্শন করিতেছেন এবং স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটিও বিচার করিয়া দেখিতেছেন; আবার অপর দিকে আমরা যেন শুনিতেছি—ভীত অর্জুনকে চমকিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে কর্মের অত্যদ্ভুত রহস্য বাহির হইতেছেঃ

যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম অর্থাৎ বিশ্রাম বা শান্তি এবং অকর্মের অর্থাৎ বিশ্রামের ভিতর কর্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম করিয়া থাকেন।২৮

ইহাই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকেই এই আদর্শে পৌঁছিয়া থাকে। সুতরাং যেমনটি আছে, আমাদিগকে তেমনিই লইতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

ধার্মিক লোকেদের ভিতর আমরা তীব্র চিন্তাশীল (জ্ঞানযোগী), লোকহিতের জন্য প্রবল কর্মানুষ্ঠানকারী (কর্মযোগী), সাহসের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারে অগ্রসর (রাজযোগ) এবং শান্ত ও বিনয়ী (ভক্তিযোগী)—এই চারি প্রকারের সাধক দেখিতে পাই।

২

বর্তমান প্রবন্ধে যাঁহার চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে, তিনি একজন অদ্ভুত বিনয়ী ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

পওহারী বাবা (শেষ জীবনে ইনি এই নামে অভিহিত হইতেন) বারাণসী জেলার গুজী নামক স্থানের নিকটবর্তী এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।২৯ তিনি অতি বাল্যকালেই গাজিপুরে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য আসিলেন।

বর্তমানকালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী—প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্নপ্রকার যোগপ্রণালীর সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্যগণের অনুবর্তী। মুসলমান রাজত্বের সময় যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'পন্থী' বলে; ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার পিতৃব্য রামানুজ বা শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন—অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন, এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাজিপুরের দুই মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁহার একখণ্ড জমি ছিল, সেইখানেই তিনি বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল বলিয়া তিনি পওহারী

বাবাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়কার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে-সকল বিশেষত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এরূপ সুপরিচিত হইয়াছিলেন, সেগুলির কোন লক্ষণ তখন তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। লোকের এইটুকুই স্মরণ আছে যে—তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থসমূহ অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন; এদিকে খুব চটপটে ও আমুদে ছিলেন। সময় সময় আমোদের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তার ফলে সহপাঠী ছাত্রগণকে বিলক্ষণ ভুগিতে হইত।

এইরূপে প্রাচীন ধরনের ভারতীয় ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন কার্যের ভিতর দিয়া ভাবী মহাত্মার বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল; তাঁহার অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষাশিক্ষায় অপূর্ব দক্ষতা ব্যতীত সেই সরল সদানন্দ ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এমন কিছু দেখা যায় নাই, যাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই প্রবল গাম্ভীর্যের পূর্বাভাস দেয়—যাহার চূড়ান্ত পরিণতি হইয়াছিল এক অদ্ভুত ও ভয়ানক আত্মাহুতিতে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই অধ্যয়নশীল যুবক—সম্ভবতঃ এই প্রথম—জীবনের গভীর মর্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন; এতদিন তাঁহার যে দৃষ্টি পুস্তকে নিবদ্ধ ছিল, এখন সেখান হইতে উঠাইয়া তাহা দ্বারা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ মনোজগৎ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া ধর্মে যথার্থ সত্য কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। এই সময় তাঁহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হইল। যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন, যাঁহার উপর এই যুবক-হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা নিষিদ্ধ ছিল, তিনি চলিয়া গেলেন; তখন সেই উদ্দাম যুবক হৃদয়ের অন্তস্তলে শোকাহত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, যাহা অপরিবর্তনীয়।

ভারতে সকল বিষয়ের জন্যই একজন গুরুর প্রয়োজন হয়। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি, পুস্তকে তত্ত্ববিশেষের ভাসা-ভাসা বর্ণনামাত্র থাকে। সকল শিল্পের, সকল বিদ্যার, সর্বোপরি ধর্মের জীবন্ত রহস্যসমূহ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্তর্জীবনের রহস্য নির্বিঘ্নে মনন করিবার জন্য সর্বদাই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি নিভৃত স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন; আর এখনও এমন একটি বন, পর্বত বা পবিত্রস্থান নাই, কিংবদন্তী যাহাকে কোন না কোন মহাত্মার বাসস্থান বলিয়া মহিমান্বিত করে নাই।

তাহার পর এই উক্তিটিও সর্বজনপ্রসিদ্ধ যে, 'রমতা সাধু, বহতা পানি। যহ কাভি না মৈল লখানি॥'

অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয় তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তেমনি যে সাধু ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিও তেমনি পবিত্র থাকেন।

ভারতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ধর্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া থাকেন—কোন জিনিষ যেমন সর্বদা নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, তাঁহারা বলেন, এরূপ ভ্রমণ করিলে তাঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ মলিনতা প্রবেশ করিবে না। ইহাতে আর এক উপকার হয় এই যে, তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করিয়া লইয়া যান। যাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ভারতের চারি কোণে অবস্থিত চারিটি৩০ প্রধান তীর্থ দর্শন করা একরূপ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এইসব চিন্তাই বোধ হয় আমাদের যুবক ব্রহ্মচারীকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তবে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞানতৃষ্ণাই তাঁহার ভ্রমণের সর্বপ্রধান কারণ। আমরা তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি, তবে তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের

প্রাচীন বাঙলা ভাষার সহিত তাঁহার ব্যাপক পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙলাদেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্পদিন হয় নাই।

কিন্তু একটি স্থানে গমনের সম্বন্ধে তাঁহার যৌবনকালের বন্ধুগণ বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কাথিয়াওয়াড়ে গিরনার পর্বতের শীর্ষদেশে যোগসাধনার রহস্যে প্রথম দীক্ষিত হন।

এই পর্বত বৌদ্ধদের চক্ষে অতি পবিত্র ছিল। এই পর্বতের পাদদেশে সেই সুবৃহৎ শিলা বিদ্যমান, যাহার উপর সম্রাটকুলের মধ্যে ধার্মিকচূড়ামণি ধর্মাশোকের সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। উহার নিম্নদেশে শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্ধকারে অরণ্যাবৃত বিরাট স্তুপরাজি লীন হইয়াছিল—ঐগুলিকে অনেকদিন ধরিয়াই গিরনার পর্বতশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা বলিয়াই লোকে মনে করিত। বৌদ্ধধর্ম এক্ষণে যে সম্প্রদায়ের সংশোধিত সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হয়—সেই ধর্মসম্প্রদায় এখনও উহাকে বড় কম পবিত্র মনে করেন না; আর আশ্চর্যের বিষয়, ঐ ধর্মের জগজ্জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দুধর্মে মিশিয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ধর্ম সাহসপূর্বক স্থাপত্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই।

৩

মহাযোগী অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র নিবাসভূমি বলিয়া গিরনার হিন্দুদের মধ্যে বিখ্যাত; আর কিংবদন্তী আছে যে, এই পর্বতচূড়ায় ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ এখনও বড় বড় সিদ্ধযোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন।

তারপর আমরা দেখিতে পাই, এই যুবক ব্রহ্মচারী বারাণসীর নিকটে গঙ্গাতীরে জনৈক যোগসাধক সন্ন্যাসীরা শিষ্যরূপে বাস করিতেছেন। এই সন্ন্যাসী নদীর উচ্চতটভূমির উপর খনিত একটি গর্তে বাস করিতেন। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মাও পরবর্তী জীবন গাজিপুরের নিকট নদীর উচ্চতটভূমিতে একটি গভীর গহ্বর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন; ইহা তিনি ওই গুরুর নিকটে শিখিয়াছিলেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যোগীরা যোগাভ্যাসের সুবিধার জন্য সর্বদাই গুহা অথবা যেখানকার আবহাওয়ার কোন রূপ পরিবর্তন নাই, এবং যেখানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করিতে পারে না, এমন স্থানে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি প্রায় এই সময়ে বারাণসীতে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতেছিলেন।

অনেক বর্ষ ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই ব্রহ্মচারী যুবক, যেস্থানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যদি তখন জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ এই বালকের মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন, যাহা প্রাচীনকালে জনৈক শ্রেষ্ঠ ঋষি তাঁহার শিষ্যের মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—সৌম্য ব্রহ্মজ্যোতিতে আজ তোমার মুখ উদ্ভাসিত দেখিতেছি।৩১ কিন্তু এক্ষেত্রে বাল্যকালের সঙ্গীরাই তাঁহার গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহাদের অনেকেই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সংসার চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসারে চিন্তার অবসর নাই, কিন্তু কর্ম অনন্ত।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সহপাঠী বন্ধু ও খেলার সাথীর (যাঁহার ভাব বুঝিতে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন) সমুদয় আচার-আচরণে এক পরিবর্তন—রহস্যময় পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। ঐ পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার মত হইবার ইচ্ছা, অথবা তাঁহার ন্যায় তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা জাগরিত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এ এক অদ্ভুত মানব—এই যন্ত্রণা ও জড়বাদপূর্ণ সংসার একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই পর্যন্ত। তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ইতোমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বারাণসীর নিকটে তাঁহার গুরু যেমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ ভূমিতে একটি গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশকরতঃ অনেকক্ষণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর

তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটিতে কাজ করিতেন, তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরের ভোগ দিতেন, তার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে যাইতেন। সেখানে সারা রাত সাধনভজনে কাটাইয়া ঊষার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং আবার নিত্যকর্ম আরম্ভ করিতেন, আমরা ভারতে এরূপ কাজকে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।

ইতোমধ্যে তাঁহার নিজের খাওয়াও কমিয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে আমরা শুনিয়াছি, উহা প্রত্যহ এক মুঠ তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্রে দাঁড়াইল। তারপর গঙ্গাতীরস্থ জঙ্গলে প্রত্যহ রাত্রে সাধনার জন্য গমন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল–তিনি নিজহাতে নির্মিত গুহাতে আরও বেশী সময় বাস করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই গুহায় তিনি দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তারপর বাহির হইতেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই জানিত না; এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'পওহারী' অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা বলিতে আরম্ভ করিল।

তিনি তাঁহার জীবনে আর কখনও এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। একবার তিনি এত অধিক দিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেক দিন পরে বাবা আবার বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন ধ্যানমগ্ন না থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার গুহার মুখের উপরিভাগে অবস্থিত একটি গৃহে বাস করিতেন, আর এই সময়ে যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। গাজিপুরের অহিফেন বিভাগের রায় গগনচন্দ্র বাহাদুর–যিনি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও

ধর্মপ্রাণতার জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন—আমাদিগকে এই মহাত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার জীবনের ন্যায়, এই জীবনেও বাহ্য কর্মমুখরতা বিশেষ কিছু ছিল না। 'বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে; আর যাহারা সত্য ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের জীবনে সত্য প্রতিফলিত হয়'—এই মহাপুরুষের জীবন ঐ ভারতীয় আদর্শেরই অন্যতম উদাহরণ। এই ধরনের ব্যক্তিগণ যাহা জানেন, তাহা প্রচার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কারণ তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাক্যের দ্বারা নয়, ভিতরের সাধনার দ্বারাই সত্যলাভ হয়। ধর্ম তাঁহাদের নিকট সামাজিক কর্তব্যের প্ররোচক শক্তিবিশেষ নয়, ধর্ম সত্যের ঐকান্তিক অনুসন্ধান এবং এই জীবনে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

কালের একটি মুহূর্ত অপেক্ষা অপর একটি মুহূর্তের অধিকতর শক্তি আছে, এ-কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন। অতএব অনন্তকালের প্রতিটি মুহূর্তই অন্যান্য মুহূর্তের সমান বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখানেই এবং এখনই ধর্মের সত্যসমূহের সাক্ষাৎ দর্শন করিবার উপর জোর দিয়া থাকেন।

বর্তমান লেখক এক সময়ে এই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, জগতের কল্যাণের জন্য কেন তিনি গুহা হইতে বাহিরে আসিবেন না। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও রসিকতার সহিত নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তর প্রদান করেনঃ

কোন দুষ্ট লোক কোন অন্যায় কার্য করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং শাস্তি-স্বরূপ তাহার নাক কাটিয়া দেয়। নিজের নাক কাটা রূপ জগৎকে কেমন করিয়া দেখাইবে, ইহা ভাবিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল ও নিজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক জঙ্গলে পলাইয়া গেল। সেখানে একটি ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া বসিয়া থাকিত, আর এদিক ওদিক কেহ আসিতেছে—মনে হইলে অমনি গভীর ধ্যানের ভান করিত। তাহার এইরূপ ব্যবহারে সরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দলে দলে লোক এই অদ্ভুত সাধু দেখিতে

এবং পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তখন সে দেখিল, এইরূপ অরণ্যবাসে আবার তাহার সহজে জীবিকানির্বাহের উপায় হইল। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে সেই স্থানের অধিবাসীরা মৌনব্রতধারী ধ্যানপরায়ণ সাধুর নিকট হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল, বিশেষতঃ জনৈক যুবক তাহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল। শেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, আর বিলম্ব করিলে সাধুর প্রতিষ্ঠা একেবারে লোপ হয়। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ঐ উৎসাহী যুবককে বলিল, 'আগামী কাল একখানি ধারাল ক্ষুর লইয়া এখানে আসিও।' যুবকটি তাহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে, এই আশায় পরম আনন্দিত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে ক্ষুর লইয়া উপস্থিত হইল। নাককাটা সাধু তাহাকে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, তার ক্ষুরখানি হাতে লইয়া উহা খুলিল এবং এক আঘাতে তাহার নাক কাটিয়া দিয়া গম্ভীর বদনে বলিল, 'হে যুবক, আমি এইরূপে এই আশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও তৎপর হইয়া সুবিধা পাইলেই অপরকে এই দীক্ষা দিতে থাক।' যুবকটি লজ্জায় তাহার এই অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না এবং সাধ্যানুসারে তাহার গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিল। এইরূপে এক নাক কাটা সাধু-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল। তুমি কি আমাকেও এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখিতে চাও?

ইহার অনেক পরে, যখন তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে ছিলেন, ঐ বিষয়ে আর একবার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপরের মনকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বলিয়া মনে কর না?'

অপর এক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞসা করা হয়, তিনি এত বড় একজন যোগী, তথাপি তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপদিষ্ট শ্রীরঘুনাথজীর মূর্তিপূজা, হোমাদি কর্ম করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'সকলেই যে নিজের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, এ কথা তুমি ধরিয়া লইতেছ কেন? একজনও কি অপরের জন্য কর্ম করিতে পারে না?'

অতঃপর সকলেই সেই চোরের কথা শুনিয়াছেন; সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চোরাই জিনিষের পোঁটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু সেই পোঁটলা লইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; শেষে পদপ্রান্তে সেই পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে সজলনয়নে নিজকৃত বাধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও অতি কাতরভাবে সেইগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘এগুলি আমার নহে, তোমার।’

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, একবার তাঁহাকে গোখুরা সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিছুকাল পরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ‘ঐ গোখুরা সাপটি আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতরূপে আসিয়াছিলেন (পাহন দেওতা আয়া)।’

আমরা এই কাহিনী অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ, আমরা জানি তাঁহার স্বভাব কী প্রগাঢ় নম্রতা, বিনয় ও প্রেমে ভূষিত ছিল। সর্বপ্রকার পীড়া তাঁহার নিকট সেই ‘প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূতস্বরূপ’ (পাহন দেওতা) ছিল; আর যদিও তিনি ঐ সকল পীড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি অপর লোক পর্যন্ত ঐ পীড়াগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই অনাড়ম্বর প্রেম ও কোমলতা চতুর্দিকের লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল; যাঁহারা চারিদিকের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব শক্তিবিস্তারের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষের দিকে তিনি আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন মাটির নীচের গুহা হইতে উঠিয়া আসিতেন, তখন লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেন বটে, কিন্তু মধ্যে দ্বার রুদ্ধ থাকিত। তিনি যে গুহা হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হোমের ধূম দেখিয়া অথবা পূজার আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তাঁহার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যখন একই কার্য করিতেন, তাহা যতই তুচ্ছ হউক—তখন তাহাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটি তাম্রকুণ্ড মাজিতেও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি যে আমাদিগকে কর্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমনভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ—তিনি নিজেই এই আদর্শের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিলেন।

তাঁহার বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিপূর্ণ ছিল না। একবার তিনি আমাদিগের নিকট অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত ভাবটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেনঃ হে রাজা, ভগবান্ অকিঞ্চনের ধন; হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে, তিনি তাহারই।—এই ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই স্বভাবতঃ তাঁহার এই বিনয় আসিয়াছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন না; কারণ, তাহা হইলে নিজেকেই আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে হয়, নিজেকে অপর অপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসাইতে হয়। কিন্তু একবার তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ খুলিয়া গেলে তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞানবারি উৎসারিত হইত, তথাপি উত্তরগুলি সর্বদা সাক্ষাৎভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে হইত।

তিনি দীর্ঘাকৃতি, মাংসল ও একচক্ষু ছিলেন এবং প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মত মধুর স্বর আর কাহারও শুনি নাই। জীবনের শেষ দশ বৎসর বা ততোধিক কাল তিনি লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে অবস্থান করিতেন। তাঁহার গৃহদ্বারের পশ্চাতে গোটাকতক আলু ও একটু মাখন রাখিয়া দেওয়া হইত; যখন তিনি সমাধিতে না থাকিতেন, তখন রাত্রে ঐগুলি গ্রহণ করিতেন। গুহার মধ্যে থাকিলে তাহাও তাঁহার প্রয়োজন হইত না। এইরূপে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ধূম দেখিলেই তিনি সমাধি হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইত। একদিন ধূমে পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিকের লোকে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার গৃহের দ্বার ভাঙিয়া ফেলিল এবং দেখিল, সেই মহাযোগী নিজেকে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি দিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত হইল।

আমাদিগকে এখানে কালিদাসের সেই বাক্য স্মরণ করিতে হইবেঃ

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের কার্যের নিন্দা করিয়া থাকে; কারণ সেই কার্যগুলি অসাধারণ এবং তাহাদের কারণও লোক ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না।৩২

তথাপি তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার এই কার্যের কারণ সম্বন্ধে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের মনে হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত; তখন তিনি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, সেজন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।

বর্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী; সেজন্য তাঁহার প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠ আচার্যদিগের অন্যতম মহাত্মার উদ্দেশ্যে—এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অযোগ্য হইলেও উৎসর্গীকৃত হইল।

১২. মদীয় আচার্যদেব

[১৮৯৬, ২৪ ফেব্রুআরী নিউ ইয়র্কে নবপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজী বিখ্যাত My Master বক্তৃতাটি দেন; ঐ বৎসরের শেষদিকে লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে উইম্বল্‌ডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। বর্তমান অনুবাদ উভয় বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলিয়াছিলেনঃ যখনই ধর্মের প্রভাব কমিয়া যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকে, তখনই আমি মানবজাতিকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি।৩৩

আমাদের এই জগৎ ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে ক্রিয়াশীল বলিয়া উভয়ত্র এই সমন্বয়-তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। আধুনিক কালে ইওরোপই প্রধানতঃ জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ। অধুনা আবার আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। বর্তমানে জড়বাদী ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী; আজ মানুষ ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করিতে করিতে নিজের দিব্য স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইতে বসিয়াছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয়ের সেই শক্তি আসিয়াছে, সেই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেঘ অপসারিত করিয়া দিবে। সেই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, অনতিবিলম্বেই তাহা মানবজাতিকে তাহার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর এশিয়া হইতে এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগের নিয়মে পরিকল্পিত। একজন মানুষই সব কিছুর অধিকারী হইবে—একথা বলা অর্থহীন। কোন একটি জাতিই যে সকল বিষয়ের অধিকারী হইবে—এরূপ ভাবা আরও ভুল। তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! অজ্ঞতাবশতঃ শিশু ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মত কাম্য আর কিছুই নাই। যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা নগণ্য—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক। অন্যদিকে আর এক জাতি ভাবিতে পারে, কেবল জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিলঃ যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বের সব কিছুর অধিকার করে অথচ তাহার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাহাতে কি সার্থকতা? ইহাই প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।

এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু চায় বা আশা করে, যাহা থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, আধ্যাত্মিক স্তরেই সে তাহা পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্নমুগ্ধ; প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও সেইরূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—পাঁচ মিনিটও যাহা স্থায়ী নহে, এমন পুতুল লইয়া সে খেলা করিতেছে! আর যে মুষ্টিমেয় জড়বস্তুকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাকেই বয়স্ক নরনারীগণ এত বড় মনে করে—ইহা চিন্তা করিয়া প্রাচ্য হাসিতেছে। একে অন্যকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ মানবজাতির উন্নতির পক্ষে যেমন আবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও সেইরূপ; আর আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা উহা অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখনই মানবকে সুখী করে নাই, কখনই করিবে না। যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, যন্ত্র আমাদিগকে সুখী করিবে, সে জোর করিয়া বলে যন্ত্রেই সুখ আছে; কিন্তু সুখ চিরকাল মনেই বর্তমান। যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই

যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান্ বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন? যদি সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেকটি পরমাণুকে বশীভূত করিতে পার, তাহা হইলেই বা কি আসিয়া যায়? যতদিন মানুষ তাহার নিজের ভিতর সুখী হইবার শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেকে জয় করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হইতে পারিবে না। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃত' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে। ইহা সত্য যে, নীল-শৈল-সাগর-সমন্বিতা নানা শক্তি ও ভাবমণ্ডিতা বাহ্যপ্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর মানবের অন্তঃপ্রকৃতি—সূর্য-চন্দ্র-তারকা, পৃথিবী তথা সমগ্র জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে এই অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জগতের গবেষণায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রাচ্য জাতি তেমনি এই অন্তর্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অতএব ইহাই সঙ্গত যে, যখন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রাচ্য হইতেই হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই সঙ্গত। আবার যখন প্রাচ্য জাতি যন্ত্রনির্মিত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে যে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত। পাশ্চাত্য জাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা বলিতে যাইতেছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত বলিবার পূর্বে তোমাদের নিকট ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তা বলিব। যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর কৃত্রিম সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হইয়াছে, যাহারা সারা জীবনটাকে পান-ভোজন ও সম্ভোগের বেদীমূলে উৎসর্গ করিয়াছে, কাঞ্চন ও ভূখণ্ডকেই যাহারা যথাসর্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইন্দ্রিয়সুখকেই যাহারা সুখের সীমা বলিয়া বুঝিয়াছে, অর্থকেই যাহারা আরাধ্য

দেবতা করিয়াছে, যাহাদের চরম লক্ষ্য ইহলোকে কয়েক মুহূর্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তারপর মৃত্যু, যাহাদের মন সম্মুখে ঝাঁপ দিতে অক্ষম, যাহারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর কোন কিছুর চিন্তা কখনও করে না, এইরূপ ব্যক্তিরা ভারতে গিয়া কি দেখে?—দেখে চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য আবর্জনা কুসংস্কার অজ্ঞতা বীভৎসভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ—তাহারা সভ্যতা বলিতে পোষাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার মাত্র বুঝে। পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের বাহ্য অবস্থার উন্নতি করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে; ভারত কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল সেখানেই এমন এক জাতির বাস, যে জাতি কখনও নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে গিয়াছে—সমগ্র ইতিহাসে কোথাও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জাতি কখনও অপরের দ্রব্যে লোভ করে নাই, যাহাদের একমাত্র দোষ এই যে, তাহাদের মস্তিষ্ক এবং দেশের ভূমি অতিশয় উর্বর, আর তাহারা গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া যেন অপরাপর জাতিকে ডাকিয়া নিজেদের সর্বস্বান্ত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, অপর জাতি তাহাদিগকে বর্বর বলিয়াছে—ইহাতে তাহাদের দুঃখ নাই, ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট। পরিবর্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরমপুরুষের দর্শন-বার্তা প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকট মানবপ্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়, যে আবরণে মানবের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত, তাহা ছিন্ন করিতে চায়; কারণ তাহারা জানে—এ সবই স্বপ্ন, তাহারা জানে—এই জড়ের পশ্চাতে মানবের প্রকৃত দিব্যভাব বিরাজমান, যাহা কোন পাপে মলিন হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না, তাপ শুষ্ক করিতে পারে না, মৃত্যু বিনষ্ট করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে জড়বস্তু যতখানি সত্য, ভারতবাসীর নিকট মানবের যথার্থ স্বরূপও ততখানি সত্য।

তোমাদের যেমন কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িবার সাহস আছে, তোমাদের যেমন স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিবার সাহস আছে, ঈশ্বরের নামে তাহাদেরও তেমনি সাহস আছে। এই ভারতেই মানুষ যখন মনের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করে এবং চিন্তা করে, তাহা যে সত্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য

পোষাক-পরিচ্ছদ, বিষয়-সম্পত্তি সকলই সে ত্যাগ করিয়া থাকে। মানব-জীবনটা দু-দিনের নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন অনাদি অনন্ত—এ কথা যখনই কেহ বুঝিতে পারে, তখন এই ভারতেই মানুষ নদীতীরে বসিয়া অনায়াসে শরীরটা পরিত্যাগ করিতে পারে, যেমন তোমরা সামান্য তৃণখণ্ড অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পার। ইহাই তাহাদের বীরত্ব—তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ তাহারা নিশ্চয় জানে যে, তাহাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত—এই শক্তিবলেই শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত রহিয়াছে; এই জাতি এখনও জীবিত এবং জাতির ভিতর ভীষণতম দুঃখ-বিপদের দিনেও ধর্মবীরের অভাব হয় নাই। পাশ্চাত্যে যেমন বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এশিয়াতেও তেমনি বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ভারতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়ীগণ তরবারি হস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে, তাহারা বর্বর ও স্বপ্নবিলাসী, তাহাদের ধর্মে শুধু পৌরাণিক গল্প, ঈশ্বর আত্মা ও অন্য যাহা কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতদিন চেষ্টা করিতেছিল, তাহা শুধু অর্থশূন্য শব্দসমষ্টি; আর হাজার হাজার বৎসর যাবৎ এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগ-বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, সেগুলি বৃথা; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণকে এই প্রশ্ন চঞ্চল করিয়া তুলিলঃ তবে কি এতদিন পর্যন্ত এই জাতির জীবন যে-আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তাহার সার্থকতা একেবারেই নাই? তবে কি আবার এই জাতিকে পাশ্চাত্য ধারায় নূতনভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে? তবে কি প্রাচীন পুঁথি-পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, দর্শনশাস্ত্রগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, ধর্মাচার্যগণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে?

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ বিজেতা পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি বলে নাই, তোমাদের পুরাতন যাহা কিছু আছে, সবই কুসংস্কারময়—সবই পৌত্তলিকতা? পাশ্চাত্য ভাবে পরিচালিত নূতন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত হইল, সুতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু

কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধানে তাহার ব্রতী হইল না; তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্য যাহা বলে, তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল—পাশ্চাত্য ভাবই সত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইল! পুরোহিতকুলের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কারণ পাশ্চাত্য এ কথা বলিতেছে! এইরূপ সন্দেহ ও অস্থিরতার ভাব হইতেই ভারতে তথাকথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল।

যদি তুমি ঠিক ঠিক সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটি জিনিষ থাকা চাই—প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভ্রাতাদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে—ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া কি তুমি যথার্থই অনুভব কর? তোমার সমগ্র সত্তাই কি এই ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এই ভাব কি তোমার রক্তের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে, তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? এই ভাব কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার তুলিতেছে? তুমি কি সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তারপর ভাবিতে হইবেঃ প্রতিকারের কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছ কিনা? তোমরা যে চীৎকার করিয়া সকলকে সবই ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে বলিতেছ, তোমরা নিজেরা কি কোন পথ পাইয়াছ? হইতে পারে প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ-সকল কুসংস্কারের সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের সহিত স্বর্ণখণ্ডও রহিয়াছে। এমন কোন উপায় আবিষ্কার করিয়াছ কি, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি, তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিতরূপে কি বলিতে পার যে, তোমার এই কল্যাণেচ্ছার পশ্চাতে অর্থ মান যশ বা প্রভুত্বের বাসনা নাই? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, তুমি যাহা চাও তাহা জান, আর

তোমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্তব্য—সেই কর্তব্যই সাধন করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, যতদিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়া থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ আচার্য ও গুরু, তবেই তুমি আমাদের নমস্য। যদি তোমার এই গুণগুলি না থাকে, তবে তুমি আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য নও। কিন্তু মানুষ বড়ই দুর্বল, বড়ই সংকীর্ণদৃষ্টি। অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার নাই, প্রকৃত দর্শনের শক্তি তাহার নাই—সে এখনই ফল দেখিতে চায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, সে নিজেই ফল ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিতে চাহে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ কর্মেই তোমাদের অধিকার আছে, ফলে কখনও নয়।

ফল কামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—ঐরূপ অসহিষ্ণুতার জন্য শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগের আকাঙ্ক্ষায় সে যে কোন একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ ভাবী সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্কারের ভাব আসিল। কিছুকালের জন্য বোধ হইল, যে জড়বাদ ও 'অহং'-সর্বস্বতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলে প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে, তাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হৃদয়ের প্রভূত সরলতা, ঈশ্বরলাভের জন্য হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা প্রভৃতি সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল, যেন সমগ্র জাতির অদৃষ্টে বিধাতা একেবারে ধ্বংস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি এরূপ সহস্র বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সেগুলির তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ তো অতি সামান্য। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইয়াছে তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া দিয়াছে; তরবারি ঝলসিত হইয়াছে; 'আল্লার জয়'-রবে ভারত-গগন বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পরে যখন বিপ্লবের বন্যা থামিল, দেখা গেল জাতীয় আদর্শ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া ভারতবাসী নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং যতদিন ভারতের জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে উন্মত্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এরূপই থাকিবে। হয়তো তাহারা চিরকাল ভিক্ষু ও দরিদ্র থাকিবে, ধূলি ও মলিনতার মধ্যে হয়তো তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষির বংশধর, এ কথা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটি মুটে-মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু-'ব্যারনে'র বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্ পর্যন্ত অরণ্যবাসী বল্কলপরিহিত অরণ্যফলমূলভোজী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে নিজেকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ঋষিগণেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই; আর যতদিন পুণ্যচরিত্রের উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরী, বঙ্গদেশের কোনও সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি শিশুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণের জীবন নিত্য ত্যাগ ও তপস্যায় পূর্ণ। জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁহার পক্ষে অল্প কয়েকটি পথই উন্মুক্ত, তাহার উপর আবার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে-কোন বিষয়কর্ম নিষিদ্ধ। আবার যথেচ্ছভাবে কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবার যো নাই। কল্পনা করিয়া দেখ—এরূপ জীবন কি কঠোর! ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের কথা তোমরা অনেক শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ—এই অদ্ভুত মানুষগুলি কিভাবে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল? দেশের সকল জাতির মধ্যে তাহারা দরিদ্রতম, ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখনও ধনের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। জগতের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিত, সেইজন্যই তাহারা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্। তাহারা নিজেরা এরূপ দরিদ্র

বটে, তথাপি দেখিবে—যদি গ্রামে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণপত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখনও অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ইহাই ভারতীয় মাতার সর্বপ্রথম কর্তব্য; যেহেতু তিনি মাতা, সেইজন্য তাঁহার কর্তব্য সকলকে খাওয়াইয়া সর্বশেষে নিজে খাওয়া। প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে হইবে—সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তবেই তিনি খাইতে পাইবেন; সেই জন্যই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলা হয়। আমরা যাঁহার জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার মাতা এইরূপ আদর্শ হিন্দু জননী ছিলেন। ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাহার বিধিনিষেধও তত বেশী। খুব নীচ জাতি যাহা খুশী খাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর জাতিসমূহে আহারে বিধিনিষেধ দেখা যায়; আর উচ্চতম জাতি, ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি, ব্রাহ্মণের জীবনে—পূর্বেই বলিয়াছি—খুব বেশী আচারনিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহারের তুলনায় এই ব্রাহ্মণদের জীবন বিরামহীন তপস্যায় পূর্ণ, কিন্তু তাহাদের খুব স্থৈর্য আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে সে-ভাব পোষণ করিয়া কার্যে পরিণত করে। একবার তাহাদিগকে কোন একটা ভাব দাও, সহজে তাহা অপসারিত করিতে পারিবে না; তবে তাহাদিগকে কোন নূতন ভাব দেওয়া বড় কঠিন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে বাস করে। কিরূপে জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে; তাহারা সেই- সকল বিধি-নিষেধের সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকে। তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় হইলেও তাহাদের ঐকান্তিক ও অসাধারণ নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মভাব দেখা যায়, কারণ সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা আসিয়াছে। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে যে, আমরা সকলে হয়তো তাহা ঠিক বলিয়া মনে না-ও করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের মতে তাহা সত্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষ সর্বদা দানশীল হইবে—এমন কি চরমভাবেও। যদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করিতে—সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে

অনশনে প্রাণত্যাগ করে, শাস্ত্র বলেন, ইহা অন্যায় নহে, বরং ইহাই মানুষের কর্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুভয় না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা এইরূপ চূড়ান্ত দানশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রাচীন সুন্দর উপাখ্যানের কথা স্মরণ করিতে পারেন। মহাভারতে লিখিত আছে, এক অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া কিরূপে একটি সমগ্র পরিবার অনশনে প্রাণ দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ এখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। মদীয় আচার্যদেবের পিতামাতার চরিত্র এই আদর্শে গঠিত ছিল। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অথিতিকে খাওয়াইতে গিয়া মাতা সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন।

এইরূপ পিতামাতার কোলে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেন—আর জন্ম হইতেই তাঁহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্মাবধিই তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত—কি কারণে তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অল্প বয়েসেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। লেখাপড়ার কাজ ছাড়া ব্রহ্মণের অন্য কাজে অধিকার নাই। এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সহিত সম্পর্কিত ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক প্রণালী হইতে খুবই ভিন্ন রকমের। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। প্রাচীন ধারণা ছিল—জ্ঞান এত পবিত্র বস্তু যে, ইহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞানবিতরণ করিতে হইবে। আচার্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন; আর শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে খাওয়া-পরাও দিতেন। এই সকল আচার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য ধনী পরিবারের লোকেরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে দান করিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং আচার্যদিগকেও ছাত্রদের প্রতিপালন করিতে হইত। যে বালকের কথা আমি বলিতেছি,

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন। বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন পরে বালকের দৃঢ় ধারণা হইল যে, সকল লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব উন্নতি। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানন্বেষণে সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য দেখা দিল; বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার নিকট এক স্থানে একটি মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে পৌরোহিত্য-কর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তোমরা যে অর্থে 'চার্চ' শব্দ ব্যবহার কর, আমাদের মন্দির সেরূপ নহে। মন্দিরগুলি সাধারণ উপাসনার স্থান নহে, কারণ ভারতে সমবেত উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

বিষয় সম্পত্তি যাঁহার বেশী আছে, তিনি এইরূপ মন্দির করিয়া দেন। মন্দিরে তিনি ঈশ্বরের কোন প্রতীক বা ঈশ্বরাবতারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভগবানের নামে পূজার জন্য তাহা উৎসর্গ করেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চে যেরূপ অর্চনা (Mass) হইয়া থাকে, এই সকল মন্দিরে কতকটা সেইভাবে পূজা হয়—শাস্ত্র হইতে মন্ত্র-শ্লোকাদি পাঠ করা হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরানো হয়; মোট কথা, আমরা একজন মহৎ ব্যক্তিকে যেভাবে সম্মান করি, প্রতিমার প্রতি ঠিক সেইরকম আচরণ করা হয়। মন্দিরে এই অনুষ্ঠানগুলিই হয়। যে ব্যক্তি কখনও মন্দিরে যায় না, তাহার অপেক্ষা যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুন সে মহত্তর বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং যে কখনও মন্দিরে যায় না, সে-ই অধিকতর ধার্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ভারতে ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, আর লোকে নিজগৃহে নির্জনেই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে মন্দিরে পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অর্থবিনিময়ে বিদ্যাদানই যখন নিন্দার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ধর্ম সম্বন্ধে যে ইহা আরও অধিক প্রযোজ্য, বলাই বাহুল্য। মন্দিরের পুরোহিত যখন বেতন লইয়া কার্য করে, তখন বলিতে হইবে, সে এই ধর্মগত বিষয় লইয়া ব্যবসায় করিতেছে। অতএব যখন দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হইয়া এই বালককে জীবিকার

একমাত্র উপায়রূপে মন্দিরে পুরোহিতের কর্ম অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ।

বাঙলাদেশে অনেক কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতসমূহ সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত। কলিকাতার রাস্তায় এবং পল্লীগ্রামগুলিতে সেই-সকল গান গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত এবং সেগুলির সারমর্ম এই যে, ধর্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে হইবে। এই ভাবটি সম্ভবতঃ ভারতীয় ধর্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাবটি নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে—ইহাই ধর্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বরদর্শন-কাহিনী ভারতে সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি। ভারতের আবহাওয়া সাধুসন্তদের ঈশ্বরদর্শনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা নিজদিগকে ঐরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ঐ-সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি বিকশিত হইলেই ধর্মের আরম্ভ। ইহাই সকল ধর্মের সার কথা।

এইজন্যই দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য, এবং তিনি খুব উচ্চ উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কথা কেহ শুনে না; আর একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয়তো ভাল করিয়া জানেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় দেশের অর্ধেক লোক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ভারতে এরূপ হয়, যখন লোকে কোনরূপে জানিতে পারে কাহারও এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধর্ম তাঁহার পক্ষে আর অনুমানের বিষয় নয়—ধর্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তিনি আর অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন না,

তখন চারিদিক হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে এবং ক্রমে তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করে।৩৪

পূর্বকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী জগন্মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা করিতে হইত। পূজা করিতে করিতে এই ভাব আসিয়া তাঁহার মন অধিকার করিলঃ এই মূর্তির ভিতর সত্যই কিছু আছে কি? সত্যিই কি জগতে আনন্দময়ী মা বলিয়া কেহ আছেন? তিনি কি সত্য সত্যই চৈতন্যময়ী এবং এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রী? অথবা এ সব কি স্বপ্নবৎ মিথ্যা? ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?

তিনি শুনিয়াছিলেন, অতীতকালে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ এইরূপে ভগবান্ লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন, ভারতের সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই জগন্মাতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। তাঁহার সমুদয় মন প্রাণ যেন সেই একভাবে তন্ময় হইয়া গেল। কিরূপে তিনি জগন্মাতাকে লাভ করিবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার এই ভাব বাড়িতে লাগিল। শেষে তিনি 'কিরূপে মায়ের দর্শন পাইব'—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে বা শুনিতে পারিতেন না।

সকল হিন্দু বালকের মনেই এই সংশয় আসিয়া থাকে। এই সংশয়ই আমাদের দেশের বিশেষত্বঃ আমরা যাহা করিতেছি, তাহা কি সত্য? কেবল মতবাদে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধে যত মতবাদ এ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি সবই ভারতে আছে। শাস্ত্র বা মতবাদ আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকেঃ এ-কথা কি সত্য যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন? যদি থাকেন, তবে আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ? পাশ্চাত্য জাতি এগুলিকে কেবল কল্পনা মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই বিশেষ কাজের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়া লোক নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এই ভাবের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহত্যাগ করে এবং কঠোর তপস্যা করিবার ফলে অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির মনে ইহা

খুবই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইবে; তাহারা যে কেন এইরূপ মত প্রকাশ করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি। তবু পাশ্চাত্য দেশে অনেকদিন বসবাস করা সত্ত্বেও আমি এই প্রাচ্য ভাবকেই জীবনে সর্বাপেক্ষা সত্য—বাস্তব বলিয়া মনে করি।

জীবনটা তো মুহূর্তের জন্য—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও, আর লক্ষ লক্ষ লোকের শাসক সম্রাটই হও। জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর—তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা খুব মন্দই হউক। হিন্দু বলেন, এ জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান—ঈশ্বরলাভ। ধর্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য হয়, তবেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্বহ হয় না, জীবনটা উপভোগ্য হয়। তাহা না হইলে জীবন একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা; শত শত যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে অনুভূতি আবশ্যক। ঈশ্বর আছেন, এইটি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বালকের হৃদয়ে যখন এই ধারণা প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার সারাদিন কেবল ঐ এক ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। দিনের পর দিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন—'মা, সত্যই কি তুমি আছ, না এ সব কল্পনা মাত্র? কবিগণ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই কি এই আনন্দময়ী জননীর কল্পনা করিয়াছেন অথবা সত্যই কিছু আছে?' আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা—যে অর্থে শিক্ষা-শব্দ ব্যবহার করি, সেরূপ শিক্ষা তাঁহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল। অপরের ভাব—অপরের চিন্তার অনুগামী হইয়া তাঁহার মনের স্বাভাবিকতা, মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনের এই প্রধান চিন্তাটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে, তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। নিয়মিতরূপে পূজা করা, সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা—তখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি দেবতাকে ভোগ দিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখনও কখনও আরতি করিতে

ভুলিতেন, আবার কখনও সব ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি করিতেন। লোকমুখে ও শাস্ত্রমুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, যাহারা ব্যাকুলভাবে ভগবানকে চায়, তাহারাই তাঁহাকে পাইয়া থাকে। এক্ষণে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সেই প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি পূজা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, ‘কখন সূর্য উদিত হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।’ তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিবার কথাও তাঁহার স্মরণ থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্বক সেবাশুশ্রূষা করিতেন, তিনি তাঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন। অজ্ঞাতসারে ঐ খাদ্য কতকটা উদরস্থ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেন, ‘মা, মা, তুই কি সত্যি আছিস, তবে আমায় কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস? সত্য কি, আমাকে তা জানতে দিচ্ছিস না কেন? আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়্দর্শন—এ-সব পড়ে শুনে কি হবে মা? এ সবই মিছে। সত্য—যথার্থ সত্য আমি সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করতে চাই। সত্য অনুভব করতে—স্পর্শ করতেই আমি চাই।’

এইভাবে সেই বালকের দিনরাত্রি কাটিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, ‘মা, আরও এক দিন বৃথা চলে গেল, তবু তোমার দেখা পেলাম না! এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর একটা দিন চলে গেল, আমি সত্যকে জানতে পারলাম না!’ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি কখনও কখনও মাটিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘বৎস, মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের নিদ্রা হইবে? সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই চিন্তার উদয় হইবে যে, কি করিয়া সে ঐ ঘরে ঢুকিয়া

মোহরের থলিটি লইবে? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, এই সকল আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত-আনন্দস্বরূপ আছেন, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।' এই বালকের হৃদয়ে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে-সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিল না, এমন কেহ ছিল না—যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান দেয়, বরং সকলেই মনে করিত, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সাধারণে তো এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, লোক তাহাকে উন্মত্ত বলে, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই জগৎ-আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোড়িত করিবে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিল। তখন তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হইতে লাগিল, নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া বালককে আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় দীক্ষিত করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে এক পরমাসুন্দরী অনুপম বিদুষী আসিলেন। পরবর্তী সময়ে এই মহাত্মা বলিলেন যে, বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমরা ভারতীয়দের বিশেষত্ব কোথায় বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ হিন্দুনারীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বাস করেন—পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে স্বাধীনতার অভাব বলে—তাঁহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন নারীর জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—কারণ ভারতে নরনারীগণও বিবাহ না করিয়া, সংসারত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করেন। এই মন্দিরে

আসিয়াই তিনি যেমন শুনিলেন যে, একটি বালক দিনরাত ঈশ্বরের নামে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে আর লোকে তাঁহাকে পাগল বলে, অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই মহিলার নিকটেই বালক প্রথম সাহায্য পাইলেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ বালকের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মত উন্মত্ততা যাহার আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র বিশ্বই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য। সে-ই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ মানুষ বড়ই দুর্লভ।' এই মহিলা বালকটির নিকট অনেক বৎসর থাকিয়া তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, নানা প্রকার যোগসাধনায় দীক্ষিত করিলেন এবং এই বেগবতী ধর্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে যেন পরিচালিত ও প্রণালীবদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন পরে সেখানে একজন পরম পণ্ডিত ও দর্শনশাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী আসিলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি গৃহে বাস করিতেন না, রৌদ্র ঝঞ্ঝা বর্ষায় বাহিরে থাকিতেন। তিনি এই সাধককে বেদান্ত-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, গুরু অপেক্ষা শিষ্য অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েক মাস তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্বোক্ত সাধিকা মহিলা ইতঃপূর্বেই দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। যখনই বালকের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তিনি চলিয়া গেলেন। আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাহা কেহই জানে না। তিনি আর ফিরেন নাই।

মন্দিরে পূজারী থাকাকালে আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে স্থির করিয়াছিল, তাঁহার একটু মাথার গোল হইয়াছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল—মনে করিল, ইহাতেই তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর থাকিবে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে লইয়া আরও মাতিয়া গেলেন। অবশ্য তাঁহার যেরূপ বিবাহ হইল, উহাকে ঠিক বিবাহের নাম দেওয়া যায় না। যখন স্ত্রী একটু বড় হয়,

তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে, আর এই বিবাহের পর স্বামী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসে—ইহাই সামাজিক প্রথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আছেন। সুদূর পল্লীতে পিত্রালয়ে বালিকাটি শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী ধর্মে মত্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে—তাই তিনি পল্লী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার স্বামী যেখানে আছেন, পদব্রজে সেখানে গেলেন। অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারতে নরনারী যে-কেহ ধর্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, তথাপি ইনি স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, 'আমি জানিয়াছি, সকল নারীই আমার জননী; তবু এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

এই বিশুদ্ধস্বভাবা মহীয়সী মহিলা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন, 'জোর করিয়া আপনাকে সংসারী করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আমি কেবল নিকটে থাকিয়া আপনার সেবা করিতে চাই, আপনার নিকট সাধনভজন শিখিতে চাই।' তিনি স্বামীর একজন প্রধান অনুগতা শিষ্যা হইলেন—তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্ত্রীর অনুমতি পাইয়া তাঁহার শেষ বাধা অপসারিত হইল এবং তিনি স্বাধীনভাবে নিজ মনোনীত পথে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

যাহা হউক, এইরূপে তিনি সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং সাধনাতেও অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল—কিভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিমান-বিবর্জিত হইবেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, ও শূদ্র' বলিয়া নিজের যে জাত্যাভিমান আছে, কিরূপে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন; কিভাবে তিনি অতি হীনতম জাতির সঙ্গে পর্যন্ত নিজের সমত্ব বোধ করিবেন। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ-প্রথা আছে, তাহাতে বিভিন্ন মানবের মধ্যে পদমর্যাদার ভেদ স্থির ও চিরনির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

জন্মবশেই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে, আর যতদিন না সে কোন গুরুতর অন্যায় কর্ম করে, ততদিন সেই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় না। জাতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ এবং মেথর বা চণ্ডাল সর্বনিম্ন। সুতরাং যাহাতে নিজেকে কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান না থাকে, এই কারণে এই ব্রাহ্মণসন্তান মেথরের কাজ করিয়া তাহার সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেথরের কাজ রাস্তা সাফ করা, ময়লা সাফ করা—কেহই তাহাকে স্পর্শ করে না। এইভাবে মেথরের প্রতি যাহাতে তাঁহার ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া তাহাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন এবং পরে নিজ দীর্ঘ কেশ দ্বারা সেই স্থান মুছিয়া দিতেন। শুধু যে এইরূপেই তিনি দীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা নহে; মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভিক্ষুককে প্রসাদ দেওয়া হইত—তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে মুসলমান, পতিত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও থাকিত। তিনি সেইসব কাঙালীদের খাওয়া হইলে তাহাদের পাতা উঠাইতেন, তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট জড়ো করিতেন, তাহা হইতে স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া অবশেষে যেখানে এইরূপ সকল শ্রেণীর ও অবস্থার লোক বসিয়া খাইয়াছে, সেই স্থান পরিষ্কার করিতেন। আপনারা এই শেষোক্ত ব্যাপারটিতে যে কি অসাধারণত্ব আছে, ইহা দ্বারা বিশেষ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ভারতে আমাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত ও নিঃস্বার্থ কাজ বলিয়া বোধ হয়। এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার কাজ নীচ অস্পৃশ্য জাতিরাই করিয়া থাকে। তাহারা কোন শহরে প্রবেশ করিলে নিজের জাতির পরিচয় দিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেয়—যাহাতে তাহারা তাহাদের স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এইরূপ নীচজাতির মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই সকল শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম যে-স্থানে বসিয়া নীচজাতি আহার করে, সে-স্থান পরিষ্কার করিতেন, তাহাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। শুধু কি তাই, রাত্রে গোপনে উঠিয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া অস্পৃশ্যদের সহিত আপনার সমত্ব বোধ করিবার

চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই ভাব ছিলঃ আমি যে যথার্থ সমগ্র মানবজাতির সেবক হইয়াছি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে তোমার বাড়ীর ঝাড়ুদার হইতে হইবে!

তারপর তাঁহার অন্তরে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এখন তাঁহারা বাসনা হইল, অন্যান্য ধর্ম কিরূপ তাহা জানিবেন। আর তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহাই সর্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য ধর্মের গুরু সন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরু বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। গুরু বলিতে শুধু গ্রন্থকীট বুঝায় নাঃ তিনিই গুরু, যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ জানিয়াছেন—অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। একজন মুসলমান সাধুকে পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে তিনি সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি মুসলমানদিগের মত পোষাক পরিতে লাগিলেন, সেই মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ের জন্য তিনি ইসলাম-ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। আর তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, এই সকল সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব-উপনীত অবস্থাতেই পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়াও একই ফল লাভ করিলেন। তিনি যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধককে পাইতেন, তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া তাঁহার সাধনপ্রণালী সাধনা করিয়াছিলেন; আর তিনি যখন যে প্রণালীতে সাধন করিতেন, সর্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণ তাঁহাকে যেমন যেমন করিতে বলিতেন, তিনি যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফল লাভ করিতেন। এইভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই সেই একই বস্তু শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরও অধিক প্রভেদ ভাষায়। মূলতঃ সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক।

তারপর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একেবারে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; আত্মা পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন।

লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই বিদ্যমান, আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই ভেদবুদ্ধি থাকিলে চলিবে না। তিনি পুরুষদেহধারী,, অতএব এক্ষণে তিনি সর্ব বিষয়ে স্ত্রীভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি নিজেকে নারী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধারণ করিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, পুরুষের কাজ সব ছাড়িয়া দিলেন, নিজ পরিবারস্থ নারীদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন—এইরূপে অনেক বর্ষ ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার মন পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান একেবারে দূর হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামের বীজ পর্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আমরা পাশ্চাত্য দেশে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সাধারণতঃ এই পূজা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করে না—এরূপ স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে তিনি করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া অর্ধবাহ্যশূন্য অবস্থায় বলিতেছেন, ‘মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি এই জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।’ ভাবিয়া দেখ, সেই ব্যক্তির জীবন কিরূপ ধন্য, যাঁহার অন্তর হইতে সর্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে। কেবল সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, নারীর মধ্যে যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাকে প্রতারণা করা যায়? তাহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় প্রবঞ্চনা ও কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতাই সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ব্যক্তি এইরূপ কঠোর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা লাভ করিলেন। আমাদের জীবনে যে-সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর তাহা রহিল না। তিনি অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার ঈশ্বর নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রচারকার্য ও উপদেশদান আশ্চর্য ধরনের। আমাদের দেশে আচার্যের খুব সম্মান, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। গুরুকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি, কিন্তু গুরু আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন; আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্যের অভ্যুদয় হইলে সকল হিন্দুই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসে, দলে দলে লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু লোকে এই আচার্যবরকে সম্মান করিল কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার কোন খেয়ালই ছিল না, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। তিনি জানিতেন—মা-ই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্বদা বলিতেন, 'যদি আমার মুখ দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়, তাহা আমার মায়ের কথা, আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই।' তিনি তাঁহার নিজের প্রচারকার্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেন নাই।

আমরা দেখিয়াছি, সংস্কারক ও সমালোচকদের কার্যপ্রণালী কিরূপ। তাঁহারা কেবল অপরের দোষ দেখেন, সব ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করিয়া গড়িতে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমত এক-একটা কল্পনা লইয়া বসিয়া আছি। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহে, কারণ সকলেই আমাদের মত উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার কিন্তু সেই ভাব ছিল না, তিনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিলঃ যখন পদ্ম ফোটে, তখন ভ্রমর নিজে নিজেই মধু খুঁজিতে আসে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।—এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা। মদীয় আচার্যদেব আমাকে শত শত বার এই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি আমি

প্রায়ই ভুলিয়া যাই। খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া একটিমাত্র প্রকৃত মহৎ চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি! অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার দিবার কিছু আছে; কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল কথা বলা বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান বলিতে বুঝায় ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটি ফুল দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতে এই ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান, আর পাশ্চাত্য দেশে যে 'প্রেরিতগণের গুরুশিষ্যপরম্পরা'' (Apostolic succession) মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর—এইটিই তোমার প্রথম কর্তব্য। আগে সত্য কি—তাহা নিজে জান, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা তোমার নিকট আসিবে। আমার গুরুদেবের মনোভাব এইরূপই ছিল, তিনি কাহারও সমালোচনা করিতেন না।

বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু কখনও শুনি নাই, তাঁহার জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন। মানুষ—হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, না হয় কর্মপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্মসমূহে এই বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন-না-কোনটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি একই ব্যক্তিতে এই চারটি ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ মানব ইহা করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যেই ভাল দেখিতেন। আমার বেশ মনে আছে, একদিন এক ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত। তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত নহেন—

স্থিরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন, ‘কেউ বা সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে, কেউ বা আবার পায়খানার দোর দিয়ে ঢুকতে পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। আমাদের কাকেও নিন্দা করা উচিত নয়।’ তাঁহার দৃষ্টি সংস্কারশূন্য ও নির্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভাব, তাহাদের ভিতরের কথাটা তিনি সহজেই ধরিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখিতে এবং সরল গ্রাম্য ভাষায় তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় একটা শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত। কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই; যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সত্তা—তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, তাই কথার জোর হয়। আমরা সকলে সময়ে সময়ে ইহা অনুভব করি। আমরা খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, অনেক সুযুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ শুনিয়া থাকি, তারপর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময় হয়তো অতি সরল ভাষায় দুই-চারটি কথা শুনিলাম—সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল যে, সারা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। যে ব্যক্তি নিজের কথাগুলিতে নিজ সত্তা, নিজ জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী৩৫—আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখান হইতে প্রতি বৎসর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদী সৃষ্টি হইতেছিল, সেই কলিকাতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন।

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের সন্ধান করিতাম, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্মপ্রচারক বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতা শেষে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, 'এই যে-সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?' তাঁহার উত্তরে বলিলেন, 'এ-সকল আমার মত ও বিশ্বাস।' অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিতাম, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের একটি কথা আমার মনে পড়িতেছেঃ বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের ভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না।৩৬

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি একজন বড় ধর্মাচার্য হইতে পারেন? আমি সারা জীবন অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'হাঁ।' 'মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?' 'হাঁ।' 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখি।' আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথমে আমি এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে-—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।' ইহা একটা তামাসার কথা নয়, বা মানুষের তৈরী কোন গল্প নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট যাইতে

লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষের বিষয় পাঠ করিয়াছিলামঃ তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। দেখিলাম, ইহা সত্য; আর যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। ধর্ম দান করা সম্ভব, আর মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, 'জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, ধর্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া-নেওয়া যাইতে পারে।' অতএব আগে ধার্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জন কর, তারপর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা বিতরণ কর। ধর্ম ব্যাক্যাড়ম্বর নহে, মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। ধর্ম কিরূপে সমিতিতে পরিণত হইবে? কোন ধর্ম কি কখনও সমিতি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ করিলে ধর্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়, আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম লোপ পায়। এশিয়াই সকল ধর্মের প্রাচীন জন্মভূমি। এমন একটি ধর্মের নাম কর, যাহা সংগঠিত দলের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটির নাম তুমি করিতে পারিবে না। ইওরোপই এই উপায়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল, আর সেইজন্যই ইওরোপ এশিয়ার মত সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবে কখনই প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ নির্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় ধর্ম হয় না; কোন গ্রন্থে, বচনে, অনুষ্ঠানে বা সমিতিতেও ধর্ম পাওয়া যায় না; ধর্মের আসল কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলেই দেখিতেছি—যতক্ষণ না সত্যকে জানা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, যতই উপদেশ শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিষেই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে—সেটি আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা

লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্মকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর সাধ্য ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই-ই কখনও একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। 'তোমরা ঈশ্বর ও ধনদেবতার সেবা একসঙ্গে করিতে পার না।'

আমার গুরুদেবের নিকট আমি আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—একটি অদ্ভুত সত্য শিক্ষা করিয়াছি; ইহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয়, তাহা নহে, ব্যক্তি হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম তীব্র কর্ম রূপে প্রকাশিত, কাহারও ভিতর গভীর ভক্তি-রূপে, কাহারও ভিতর যোগ-রূপে, কাহারও ভিতর বা জ্ঞান-রূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে—এ কথা বলা ভুল। এইটি করিতে হইবে, এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবেঃ সত্য একও বটে, বহুও বটে। বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে; এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে 'বহুত্বে একত্ব' বুঝায়, ব্যাবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন সেই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত অপরিণামী নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—ক্ষুদ্রাকারে সমষ্টির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকাল বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে ধর্মসম্প্রদায়ের

অন্ত নাই, আর দুর্ভাগ্যবশতই হউক বা সৌভাগ্যবশতই হউক, যে-কোন ব্যক্তি ধর্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সে-ই একজন প্রতিনিধি সে-দেশে পাঠাইতে চায়; এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সহিত আমি পরিচিত। এমন কি, 'মর্মনেরা' (Mormons) পর্যন্ত ভারতে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে; সেই তো ধর্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সেখানেই ধর্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্মপ্রচার কর—উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরনের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে; আর জীবৎকালেই সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজিত হইবার তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ ভারতে আমরা এই একটি বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি সকলেই বলিবে, তাহারা এক ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পর্বতে উৎপন্ন হইয়া, ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।'৩৯ ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্যতঃ স্বীকার করিতে হইবে; তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলেন, 'অপর ধর্মে কিছু সত্য আছে; হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে'—সেভাবে নহে। আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—'অন্যান্য ধর্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু আমাদের ধর্মে উহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে!' একজন বলিতেছেন, 'আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন', আবার অপর একজন তাহার ধর্ম সর্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই মানুষকে মুক্ত করিবার সমান শক্তি আছে। মন্দিরে বা চার্চে ধর্মসকলের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র।

সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সারা দেন। অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মারও রক্ষা এবং উদ্ধারের জন্য তুমি, আমি বা অপর কোন মানুষ দায়ী নয়, সেই এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে নিজদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র জনসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষক। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার তবে তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান হইতে তাহাকে একটু উপরে তুলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু মানুষের যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন; কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন প্রকার উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে, তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্যন্ত করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলিয়া দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মন কোনরূপ কুচিন্তা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়। বেদ বলেনঃ ‘ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।’ যীশু বলিয়াছেন, ‘তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।’

সব বড় বড় আচার্য ও মহাপুরুষগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিক লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না

কেন, সকল ধর্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে; আর ত্যাগের ভাব যত কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়পরতা ততই ধর্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, এবং ধর্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁহারা সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদিগকে সমুদয় ধন-ঐশ্বর্য মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়; আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতে না, তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্যন্ত এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহই যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল, যাহাদের নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এইসব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন-জয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি; এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্র ছিল না, আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এইরূপ মানুষের অতিশয় প্রয়োজন। বর্তমানকালে লোকে যাহাকে নিজেদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত তাহারা এক-মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে; এ সময়ে এরূপ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এমন একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন মানুষ আছেন, যিনি সংসারের সমুদয় ধন রত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহেন। বাস্তবিক এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতেন। এরূপ ঘটনা যে দু-এক দিন ঘটিয়াছিল তাহা নহে, মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গেল। মানবজাতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল। যাহারা

তাঁহার কৃপালাভের জন্য আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় ঘা হইল, তথাপি অনেক বুঝাইয়াও তাঁহার কথা বলা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্বদা থাকিতাম; যাহাতে তাঁহার কষ্ট না হয়, এজন্য লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত, 'এইসব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?' তিনি হাসিয়া একমাত্র উত্তর দিতেন, 'কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহ পরের সেবায় যায়, তবে তো ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।' একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, 'মহাশয়, আপনি তো একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।' প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিল, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি—তুমি অপরাপর সংসারী লোকেদের মতই কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?'

এইরূপে তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, তাঁহার দেহাবসান সন্নিকট, তাই পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্মাচার্যগণের নিকট লোক আসিয়া কিরূপে চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশাতেই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্যই অপেক্ষা করে। এইরূপ ধর্মানুরাগ হইতেই মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধে ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, তাহা যত চমৎকারই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে

না; কিন্তু ধর্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বাক্য দ্বারা হইবে না, নিজে ধর্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট—কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে।

যখন লোক শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল। আমাদের গুরুদেব নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর-দূরান্তর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তি পাইতেন না। তিনি বলিতেন, ‘যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ উপদেশ দিব।’ আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিলাম।

তাঁহার ভাব ও উপদেশাবলী প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। গৃহী ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহারা তাহাদের সম্মুখে যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বছরের পর বছর এই দিব্য জীবনের সংস্পর্শে আসাতে প্রবল উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে লাগিল, আর যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাত, তথাপি তাহারা যে শহরে জন্মিয়াছিল, তাহারই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃঢ়তর হইয়া রহিল, আর দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করিতে লাগিল—অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রচারিত

ভাবসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে তাহা দান করিয়া গেলেন—আর সে সত্যকে জীবন্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে রাখিয়া গেলেন।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হইয়াছে; যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।

এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল—এই যুগে এইরূপ ত্যাগ আবশ্যক। আধুনিক নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র অনাঘ্রাত পুষ্পের মত কেহ থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যাহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাহাদের বয়স বেশী হয় নাই, তাহারা সংসার ত্যাগ কর। ধর্মলাভের ইহাই রহস্য—ত্যাগ কর। প্রত্যেক নারীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। ভয় কি? যেখানেই থাক না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। এইরূপ ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, পাশ্চাত্যদেশে জড়বাদের কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চোখে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কি ভীষণভাবে কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? কেবল বাক্যের দ্বারা অথবা সংস্কার-আন্দোলনের দ্বারা নয়—ত্যাগের দ্বারাই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মভাব লইয়া অটল অচল সুমেরুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিলে তবেই তোমরা এই সকল অধর্মের ভাব রোধ করিতে পারিবে। বাক্যব্যয় করিও না, তোমার দেহের প্রত্যেকটি লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্র কাঞ্চনের জন্য এই চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ শক্তি গিয়া আঘাত করুক; তাহারা কাঞ্চনের জন্য এই তীব্র আগ্রহের মধ্যে কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য

হউক। আর কামও ত্যাগ কর। কাম-কাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—তুমি ছাড়া আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ, সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে—তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও নবীনতম, সেই বলবান্ সুন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী, তাহাদিগকেই ভগবানের বেদীতে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে; আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া সমগ্র মানবজাতির সেবক হও—সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্মপ্রচার কর। ইহাকেই তো ত্যাগ বলে, শুধু বাক্যদ্বারা ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও, এবং কাজে লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। কথায় কখনও কোন কাজ হয় না—কতই তো প্রচার হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। প্রতিমুহূর্তেই অর্থ পিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ উহাদের পশ্চাতে কেবল ফাঁকি— ঐ-সকল গ্রন্থের ভিতরে কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমায় বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহাকেই তোমার ধর্মভাব স্পর্শ করিবে।

বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এইঃ মতামত, সম্প্রদায়, গীর্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি আসিয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর। কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চার করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে—তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

তাহা হইলে তোমরা এরূপ হও! কোন দেশে—এরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, সেই দেশ ততই উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এইঃ 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে!' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমাদের মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলিয়া, তোমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখিতে পাইবে; বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রতঙ্গ মাত্র।

১৩. শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে স্থূল অর্থেই অবতার বলে মনে করতেন, যদিও এর ঠিক কি অর্থ, তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমি বলতাম, বৈদান্তিক অর্থে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। দেহত্যাগের ঠিক কয়েক দিন আগে তাঁর খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল; আমি যখন মনে মনে ভাবছি—দেখি, এই কষ্টের মধ্যেও তিনি নিজেকে অবতার বলতে পারেন কিনা—তখনই তিনি আমাকে বললেন, ‘যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ দেহে রামকৃষ্ণ; তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।’ তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন—এজন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করত। যে-কোন লোককেই দেখামাত্র তিনি তার চরিত্র বুঝে নিতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর সে মতের আর পরিবর্তন হত না। আমরা কোন মানুষকে বিচার করি যুক্তি দিয়ে, সেজন্য আমাদের বিচারে থাকে ভুল ত্রুটি; তাঁর ছিল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁর অন্তরঙ্গ বা ‘ভেতরের লোক’ বলতেন—তাদের তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের রহস্য শেখাতেন। বাইরের লোক বা বহিরঙ্গদের কাছে বলতেন নানা উপদেশমূলক গল্প; এগুলিই লোক ‘শ্রীরামকৃষ্ণের কথা’ বলে জানে। ঐ অন্তরঙ্গ তরুণদের তিনি তাঁর কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতেন, অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাতে তিনি কান দিতেন না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের মধ্যে শেষোক্তদের কাজকর্ম দেখে প্রথমোক্তদের তুলনায় তাদের প্রতিই আমার অনেক বেশী ভাল ধারণা হয়েছিল। তবে অন্তরঙ্গদের প্রতি আমার ছিল অন্ধ অনুরাগ। লোকে বলে—আমাকে ভালবাসলে আমার কুকুরটিকেও ভালবেসো। আমি ঐ ব্রাহ্মণ-পূজারীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সুতরাং তিনি যা ভালবাসেন, যাঁকে তিনি মান্য করেন—আমিও তাই ভালবাসি, তাঁকে আমি মান্য করি। আমার সম্বন্ধে তাঁর ভয় ছিল, পাছে আমাকে স্বাধীনতা দিলে আমিও আবার এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বসি।

তিনি কোন একজনকে বললেন, ‘এ জীবনে তোমার ধর্ম লাভ হবে না।’ সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি যেন দেখতে পেতেন। বাইরে থেকে যে মনে হত—তিনি কারও কারও উপরে

পক্ষপাতিত্ব করছেন, এই ছিল তার কারণ। চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-সম্পন্ন তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন রকম সাধনা নির্দেশ করতেন। তাঁর ঘরে অন্তরঙ্গদের ছাড়া আর কাউকেই শুতে দেওয়া হত না। যারা তাঁর দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না, আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।

উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম জনসাধারণের নিকট তিনি 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতেন।

সাধারণতঃ তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ জাতির আদর্শ

কোন জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ হবে 'পরব্রহ্ম'। কিন্তু তোমরা সকলেই কোন বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে না বলেই তোমাদের একটি ব্যক্তির আদর্শ অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রীরাকৃষ্ণের মধ্যে তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ। অন্য কোন ব্যক্তি এ যুগে আমাদের আদর্শ হতে পারেন না, তার কারণ তাঁদের কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। বেদান্তের ভাব যাতে এ যুগে প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য এমন মানুষের আজ আমাদের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরাকৃষ্ণের মধ্যে এই অভাব পূর্ণ হয়েছে। আজ প্রত্যেকের সামনেই এই আদর্শ তুলে ধর। সাধু বা অবতার, যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ কর না কেন—তাতে কিছু আসে যায় না।

তিনি একবার বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের মধ্যে আবার আসবেন। আমার মনে হয়, তারপর তিনি বিদেহ-মুক্তির অবস্থায় ফিরে যাবেন। কাজ করতে হলে প্রত্যেকেরই একজন ইষ্টদেবতা থাকা প্রয়োজন—খ্রীষ্টানেরা যাকে বলে 'গার্ডিয়ান এঞ্জেল'—এ ঠিক তাই। আমি মাঝে মাঝে যেন কল্পনা করি, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ইষ্টদেবতা আছেন। আর

তাঁদের প্রত্যেকেই যেন আধিপত্য লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। এ ধরনের ইষ্টদেবতার– কোন জাতির কল্যাণ করার ক্ষমতা থাকে না।